সত্যের তরবারী ঝলসায়

আবদুল মান্নান তালিব

সত্যের তরবারী ঝলসায়

সত্যের তরবারী ঝলসায়

THE RADINAT SWORD OF TRUTH

سيف الحق الإشاعى

সত্যের তরবারী ঝলসায়
আবদুল মান্নান তালিব
প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ২০০০ ইংরেজী
মুহার্‌রম, ১৪২১ হিজরী
বৈশাখ, ১৪০৭ বাংলা

প্রকাশক

করপোরেট হেড কোয়ার্টার
দারুসসালাম
পোঃ বক্সঃ ২২৭৪৩, রিয়াদঃ ১১৪১৬, সৌদি আরব
ফোনঃ ০০৯৬৬-১-৪০৩৩৯৬২-৪০৪৩৪৩২
ফ্যাক্সঃ ০০৯৬৬-১-৪০২ ১৬৫৯
বিক্রয়কেন্দ্র ঃ ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০০৯৬৬-১-৪৬১৪৪৮৩
শাখাসমূহ ঃ
দারুসসালাম
৫০, লোয়ারমল, লাহোর, পাকিস্তান
ফোন ঃ ০০৯২-৪২-৭২৪ ০০২৪, ৭২৩২৪০০
ফ্যাক্স ঃ ০০৯২-৪২-৭৩৫ ৪০৭২
দারুসসালাম পাবলিকেশন্স
পোঃ বক্স ৭৯১৯৪, হিউস্টন, টি এক্স ৭৭২৭৯, যুক্তরাষ্ট্র
ফোন ঃ ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪১৯, ফ্যাক্স ঃ ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪৩১
দারুসসালাম
৫৭২-আটলান্টিক এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২১৭ যুক্তরাষ্ট্র
ফোন ঃ ০০১-৭১৮-৬২৫ ৫৯২৫
আল হিদায়াহ্‌ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন
৫২২ কভেন্ট্রি রোড, বারমিংহাম বি ১০ ও ইউ এন, যুক্তরাজ্য
ফোন ঃ ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ১৮৮৯, ফ্যাক্স ঃ ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ২৪২২
দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
৩০ মালিটোলা, বংশাল, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ
ফোন ঃ ০০৮৮-০২-৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স ঃ ০০৮৮-০২-৯৫৫৯৭৩৮

সত্যের তরবারী ঝলসায়

আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা
সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী, ঢাকা

দা রু স সা লা ম
রিয়াদ • লাহোর • হিউস্টন • নিউইয়র্ক • ঢাকা

আমাদের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থরাজি

- বাংলা আল-কুরআনুল কারীম
- বাংলা আল-কুরআনুল কারীম ৩০তম পারা
- মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য?
- যুগস্রষ্টা সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়া
- স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য
- সত্যের তরবারী ঝলসায়
- ইসলামী নামকরণ
- ঈমান নবায়ন
- মহানবীর শাশ্বত পয়গাম
- নামায নির্দেশিকা
- নবী (সাঃ)-এর নামায
- হজ্জ ও উমরাহ্ নির্দেশিকা
- ঘুষ ঃ ইসলামী সংস্কারের পথে প্রধান বাধা

প্রকাশকের নিবেদন

'শাসকের সম্মুখে সত্য উচ্চারণ করা সর্বোত্তম জিহাদ' এবং 'আলেমগণ নবী ও রাসূলগণের উত্তরাধিকারী'-এই দু'টি আপ্ত বাক্যের সরল পরিস্ফুটন ঘটেছে বক্ষমান গ্রন্থের রচনাবলীতে।

উমাইয়া এবং আব্বাসী আমলে নামেমাত্র খিলাফত ছিল। খিলাফতের নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। খিলাফতের প্রায় সকল ইন্সটিটিউশন ধূলিসাৎ করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের নামে স্বেচ্ছাচারী শাসন চলতে থাকে।

ইতিহাসের ধূসরতম সে অধ্যায়ে যেসব মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মুফাস্সির, ফকীহ্, হাদীসবেত্তা এবং আলেম-উলামা একনায়ক শাসকদের ইসলাম বিরোধী কাজের সরাসরি সমালোচনা করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন এবং দ্বীনে-হকের কথা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন এবং এসব করতে গিয়ে শাসকের কোপানলে পড়েছেন, অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টিম রোলার সহ্য করেছেন, সেসব ক্ষণজন্মা মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে এই গ্রন্থের উপস্থাপনা।

এসব মনীষী ইসলামের মেঘলা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এঁরা ইসলামের ভাগ্যাকাশ জুড়ে ধ্রুবতারার মত দেদীপ্যমান থেকে পথহারা নাবিকদের দিক-নিদের্শনা দিয়েছেন এবং ঠিকানা বাতলিয়ে দিয়েছেন। পথহারাদের পথচলা তাই কখনও থেমে থাকেনি। চড়াই-উতরাই করে এগিয়ে গেছে।

ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তিই হলো সত্যের সম্মুখ প্রকাশ। প্রকাশ ছাড়া এর অস্তিত্ব নেই। কাল থেকে কালান্তরে নবী ও রাসূলগণ সত্যের এ ঋদ্ধ প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। দুর্দমনীয় সাহস সঞ্চয় করে দোর্দন্ড প্রতাপশালী রাজা, বাদশাহ্ বা ছোট ছোট খোদার দরবারে হাজির হয়ে অকুতোভয়ে সত্য উচ্চারণ করেছেন। সত্য উচ্চারণের সে সিলসিলা তাদের অনুবর্তী ও উত্তরাধিকারী আলেম-ওলামাগণ চিরকাল জারি রেখেছেন বলেই ইসলাম প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আজও সমুজ্জ্বল আজও অম্লান।

দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এসব মনীষীর সংগ্রামী জীবনের ওপর অজস্র গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হলেও বাংলাভাষায় তেমন একটা হয়নি। লেখাগুলো পূর্বে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সব দেশে সব সমাজে সত্যের উচ্চারণ অব্যাহত রাখতে হলে এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ অপরিহার্য, এ বিবেচনাতেই বক্ষমান গ্রন্থের প্রকাশনা।

গ্রন্থকার জনাব আবদুল মান্নান তালিব, পৃষ্ঠপোষক জনাব মুহাম্মাদ শরীফ হোসেন, সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক, মলাট শিল্পী জনাব আবদুল হামীদ ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহ্‌সহ যাঁরা এ গ্রন্থ প্রকাশনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন পঞ্চশীর্ষতম, যুক্তরাজ্যে দ্বিতীয় শীর্ষতম এবং সৌদি আরবে চতুর্থ শীর্ষতম স্থানে। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এ আমাদের তৃতীয় উপহার। আশা করি অন্যান্য গ্রন্থের মত এ গ্রন্থও তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন।

জীবিকার প্রয়োজনে আজ যেমন ইংরেজী ও আরবী ভাষা শিখতে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাও ব্যাপকভাবে শিখতে হবে। বাংলা ভাষা-ভাষীদের সম্মান ও মর্যাদা তখন অত্যুচ্চে পৌছে যাবে। আমরা আনন্দঘন সে দিনটির জন্য অতি আগ্রহে শুধু অপেক্ষাই করছিনা, কাজও করছি। আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের উত্তম কাজগুলো কবুল করুন।

রিয়াদ : এপ্রিল, ২০০০ ইং

আবদুল মালেক মুজাহিদ
জেনারেল ম্যানেজার

সূচীপত্র

যে যুদ্ধ ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল

দুনিয়ায় এ পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিক দিয়ে বদরের যুদ্ধ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই একটি মাত্র যুদ্ধের ফলে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ইতিহাসের ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। এই একটি যুদ্ধে ইসলামী শক্তির বিজয় আরো বহু যুদ্ধের জন্ম দেয় এবং এই যুদ্ধগুলো একটি বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। এর ফলে ইসলামী চিন্তাধারা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী পরিব্যাপ্ত হবার পথ সুগম হয়। ইসলামের বিজয়ের স্বার্থে পরিচালিত এই যুদ্ধগুলোতে ঈমানের সাথে কুফরীর মোকাবিলা হয়। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি লড়াই করে বেইনসাফী, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে। এইসব যুদ্ধে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ঈমান শক্তি অর্জন করে এবং প্রত্যয়ের শিখা উদ্দীপিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে।

বদরের অবস্থান

বদর মূলত একটি পাহাড়ী ঝরণার নাম। বদর ইবনে কুরাইশের নামে এ ঝরণাটির নামকরণ হয়। তারপর থেকে এই নামেই এই পাহাড় এবং সমগ্র এলাকাটি পরিচিত হয়।

বদর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মাঝখানের দূরত্ব কাফেলার পথে, যে পথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন প্রায় একশত ষাট মাইলের মতো। অন্যদিকে মক্কা মুকাররমা থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত এবং উভয় স্থানের মধ্যে দূরত্ব কাফেলার পথে দুইশত পঞ্চাশ মাইলের মতো। মোটর গাড়ী যোগে বর্তমানে মক্কা থেকে বদর যেতে ৩৪৩ কিলোমিটার এবং মদীনা থেকে ১৮৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। ওদিকে বদর ও লোহিত সাগর উপকূলের মধ্যকার সর্বাধিক নিকটবর্তী স্থানটির দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। লোহিত সাগর বদরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

যুদ্ধের পটভূমি

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি

একাদিক্রমে তের বছর ধরে মক্কার মুশরিকদের সকল প্রকার শিরক বিমুক্ত আল্লাহর তাওহীদ ও বন্দেগীর দাওয়াত দিতে থাকেন। ইসলামকে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত করে সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে পেশ করতে থাকেন। কিন্তু কুরাইশদের বৃহত্তম অংশ কেবল তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানই করেনি বরং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা এবং তাঁকে ও তাঁর সাথে মুষ্টিমেয় ইসলাম গ্রহণকারীকে নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিতে থাকে। তিনি সবরের সাথে তাদের সকল আক্রমণের মোকাবিলা করেন। তারা তাঁর ও তাঁর সাথীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে এবং তাঁদের ওপর চরম শারীরিক নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

ফলে তিনি ও তাঁর সাথীরা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। এখানে এসে তিনি মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা এখানেও তাঁকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। তারা মদীনা আক্রমণ করে এই নবীন ও সদ্যজাত ইসলামী রাষ্ট্রটিকে অংকুরে বিনষ্ট করার পরিকল্পনা করে।

এবার যুদ্ধের ময়দান

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুনলেন কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে তখন তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে কুরাইশদের মোকাবিলা করার জন্য মুসলমানদের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা দিলেন। তিনি সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন না। কারণ কুরাইশদের সেনাদল সেদিক থেকে আসছে বলে তিনি খবর পেয়েছিলেন। সে দিন ছিল সোমবার এবং রমযানের ৮ তারিখ।

মুসলিম সেনাদলে ছিলেন ৮৬ জন মুহাজির, আনসারদের আওস গোত্রের ৬১ জন এবং খাযরাজ গোত্রের ১৭০ জন। সব মিলিয়ে ৩১৭ জন। সমগ্র সেনাদলে মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল। একটি ছিল মিকদাদ ইবনুল আমওয়াদের এবং দ্বিতীয়টি ছিল যুবাইর ইবনুল আওয়ামের। সর্বমোট উট ছিল ৭০টি। পালাক্রমে ৩ জন ৪ জন করে সেগুলোর পিঠে সওয়ার হতেন। যুদ্ধাস্ত্রও ছিল অতি সামান্যই। মাত্র ৬০ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত। কয়েকজনের হাতে তো কোনো অস্ত্রই ছিল না। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরা লড়াই করবেন। সুবহানাল্লাহ!

কী ছিল তাঁদের মনোবল! কেমন ছিল আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল! কত জবরদস্ত ভরসা ও নির্ভরতা ছিল আল্লাহর প্রতি! তাঁদের ঈমানী জোশ ও আত্মমর্যাদাবোধ কল্পনাতীত ছিল। অন্যদিকে মুশরিক সৈন্যদের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশি। তারা প্রত্যেকেই সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত ছিল। মক্কার বড় বড় সরদাররা সবাই এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। স্বল্পসংখ্যক মুসলমান সংখ্যায় তাদের চাইতে তিনগুনের বেশি এবং যুদ্ধাস্ত্রে বহুগুণ এগিয়ে যাচ্ছিল।

কুরাইশরা মক্কা থেকে রওয়ানা হবার পূর্বে কাবার গেলাফ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে এই দোয়া করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! উভয় দলের মধ্যে যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, উভয় সেনাদলের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ এবং উভয় দলের মধ্যে যারা উত্তম এবং যাদের দীন শ্রেষ্ঠ তাদেরকে তুমি সাহায্য করো এবং বিজয় দান করো।"

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের এই দোয়া শুনেছেন কবুল করেছেন এবং উত্তম ও সত্যপন্থীদের বিজয় দান করেছেন।

যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আবেগ ও বিনয় সহকারে আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে আমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অংগীকারের বরাত দিচ্ছি। হে আল্লাহ্ ! আজ যদি তুমি এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে আজকের পরে এই বিশ্বভূখন্ডে তোমার বন্দেগী করার কেউ থাকবে না।"

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, একটি ছায়াতলে কিছুক্ষণের জন্য তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। পরক্ষণে জেগে উঠে হযরত আবু বকরকে (রাঃ) আনন্দের সাথে বললেন, "আবু বকর ! সুসংবাদ। আল্লাহর মদদ এসে গেছে। জিবরাইল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছেন।"

মুসলমানদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার জন্য এ যুদ্ধে ফেরেশতারাও শরীক হন। কুরআনের সূরা আনফালের ৯ ও ১০ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "স্মরণ করো, তোমরা তোমাদের রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে, যারা একের

পর এক আসবে।" আল্লাহ্‌ এটা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেবার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহায্য তো কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসে, আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"

যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সেনাদলকে সম্বোধন করে বললেন, "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আজকের দিন যে ব্যক্তিই ময়দানে সুদৃঢ় ও অবিচল থাকবে, আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশায় যুদ্ধ করবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন না, আল্লাহ্‌ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" উমর ইবনে হুমাম মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি একথা শুনলেন, তাঁর হাতে ছিল খেজুর। তখনো তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এতটুকু ব্যবধান। তিনি খেজুর খাওয়া পছন্দ করলেন না, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং শাহাদতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে কাফেরদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। লড়াই করতে করতে কয়েকজনকে নিহত করে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেনঃ "আমি বদর যুদ্ধের দিন সেনাবাহিনীর ব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার দুপাশে তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে-বামে দুটি কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এ সময় তাদের একজন অন্যজন থেকে গোপন করে আমার কানে কানে বললোঃ চাচাজান। আমাকে দেখিয়ে দিন তো আবু জাহল কে? জিজ্ঞেস করলাম, ভাতিজা, তাকে দিয়ে তুমি কি করবে? বললো, আমি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাকে দেখতে পেলে হত্যা করবো এবং প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে দেবো। অন্যজনও তার সংগীকে গোপন করে আমাকে একই প্রশ্ন করলো। তাদের এই প্রশ্নে আমার মনে হলো আমি দু'জন শক্ত সমর্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমি ইশারায় তাদের দুজনকে আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা তখনি দুটি শিকারী বাজের ক্ষিপ্রতায় আবু জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং দেখতে না দেখতেই তাকে খতম করে দিল। (বুখারী) যুদ্ধের পরের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মৃতদের মধ্যে আবু জাহলের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সে

মৃত্যু যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। আফরার দুই পুত্র মুআয ও মুআওয়ায তাকে ভীষণভাবে জখম করেছে।" (বুখারী)

উভয় পক্ষের আক্রমণ প্রতি আক্রমণে যুদ্ধ যখন একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাদের মধ্যে নিজেই উপস্থিত হয়ে গেলেন। তাঁকে ময়দানে প্রবেশ করতে এবং তাঁকে দেখে মুসলিম সেনাদলের জিহাদী জোশ উদ্বেলিত হতে দেখে কাফেররা শংকিত হলো। সাহাবাগণ বিদ্যুৎবেগে সারা ময়দান চষে বেড়াচ্ছিলেন। সামনে যে কাফের সেনাকে পাচ্ছিলেন, তাকেই খতম করে দিচ্ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনের দিকে ছিলেন এবং তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করছিলেনঃ "এই দলতো এখনই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বরং কিয়ামত তো তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততা।"

(সূরা আল কামারঃ ৪৫-৪৬)

মুসলমানদের উপর্যুপরি আক্রমণে কাফেররা পরাজিত হলো। তারা সত্তরটা লাশ এবং মুসলমানদের হাতে সত্তর জনকে বন্দী অবস্থায় রেখে অত্যন্ত করুণ ও লাঞ্ছিত অবস্থায় পলায়ন করলো। মুসলমানদের মোট ১৪ জন শাহাদত লাভ করলো। এদের মধ্যে ছয় জন ছিল মুহাজির এবং আট জন আনসার।

এই যুদ্ধে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে একটা চূড়ান্ত সীমারেখা টেনে দিল। একদিকে শুরু হলো ইসলামের অগ্রগতি এবং অন্যদিকে কুফরের পশ্চাদপসরণ। এরপর সমস্ত আরব উপদ্বীপ থেকে কুফরীর অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে গেলো এবং সমগ্র বিশ্ব ঝলমলিয়ে উঠলো ঈমানের আলোকচ্ছটায়।

এ আলো এখনো তার দ্যুতি ছড়িয়ে চলছে।

বদর যুদ্ধের প্রেরণা ছিল বৈষয়িক স্বার্থমুক্ত

দুনিয়ার ইতিহাসের হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহের পথ ধরে মানুষের সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, এগিয়ে গেছে। অনেক বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বীরদের বীরত্ব কাহিনী ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা আছে। কিন্তু বিশ্বমানবতার রহমত স্বরূপ যাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তিনি যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তখন যুদ্ধের চেহারা পাল্টে গেলো। যুদ্ধের উদ্দেশ্য বদলে গেলো।

এই যুদ্ধ দেশ জয় বা সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য ছিল না। বরং যুদ্ধ ছিল- ওয়া জাআলা কালেমাতাল্লাযিনা কাফারুস সুফলা ওয়া কালেমাতুল্লাহি হিয়াল উলইয়া- "কাফেরদের কথা নীচু করে দেয়া এবং আল্লাহর কথা তো উঁচু ও বাঙময় আছেই।" অর্থাৎ জাগতিক ও বৈষয়িক কোন স্বার্থ নয় বরং আল্লাহর বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করাই মূল লক্ষ্য।

এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রথম যুদ্ধটি করেন সেটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্বার্থ চিন্তা মুক্ত করার জন্য তিনি সর্বাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ঘটনাটি যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল সেটি ছিল কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা, যার মূল্য ছিল প্রায় ৫০ হাজার আশরাফী। আবু সুফিয়ানকে মদীনার পাশ দিয়েই যেতে হবে। তার সাথে ছিল মাত্র ৪০ জন রক্ষী। মদীনার মুসলমানরা এ সম্পদ লুট করে নিতে পারে এই ভয়ে সে মক্কায় লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে, মুসলমানরা তার ওপর আক্রমন করার জন্য এগিয়ে আসছে। সম্পদ বাঁচাতে হলে এবং মুসলমানদের মাথা চিরকালের জন্য নত করে দিয়ে মদীনার পাশ দিয়ে কাফেলার পথ সুগম করতে হলে এখনই বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসো। কাফেররা বিশাল বাহিনী নিয়ে এই প্রথম বারের মতো সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদেরকে নাস্তানাবুদ করার জন্য এগিয়ে আসছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের মনোভাব অনুভব করতে পারলেন। তিনি আনসার ও মুহাজির সবাইকে ডেকে তাদের সামনে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি তুলে ধরলেন এবং বললেন, একদিকে আছে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে আসছে কুরাইশদের বিশাল সেনাবাহিনী। আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে, এ দুটির মধ্যে যে কোনো একটি তোমরা লাভ

করবে। এখন বলো তোমরা কোনটির মোকাবিলায় যাবে? জবাবে বৃহত্তম গোষ্ঠীই বাণিজ্য কাফেলার মোকাবিলায় এগিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কিছু চাচ্ছিলেন। তাই তিনি প্রশ্নটি আবার করলেন।

একথায় মুহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) উঠে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনার রব যেদিকে যাওয়ার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। যেদিকে আপনি যাবেন আমরা সেদিকেই যাবো। আমরা বনি ইসরাইলদের মতো একথা বলবো না হে মূসাঃ "যাও, তুমি ও তোমার রব গিয়ে লড়াই করো, আমরা তো এখানে বসে রইলাম।" আমরা বলবো "চলুন, আপনি ও আপনার রব লড়াই করুন এবং আমরাও আপনার সাথে মিলে লড়াই করে জীবন দিয়ে দেবো।"

কিন্তু আনসারদের ফায়সালা না শুনে আল্লাহর নবী (সাঃ) লড়াই করতে চাচ্ছিলেন না। কেননা এখনো সামরিক ক্ষেত্রে তাদের কোনো সাহায্য নেয়া হয়নি এবং তাদের পরীক্ষা এখনো বাকি ছিল। তাই তিনি সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন না করে প্রশ্নটি তৃতীয়বার করলেন। এ অবস্থায় সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) উঠে বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদেরকেই এ প্রশ্নটা করছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন সা'দ বললেন।

"আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আপনি যা কিছু এনেছেন সবই সত্য। আপনার কথা শোনার এবং আপনার হুকুম মেনে চলার জন্য আমরা ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। কাজেই হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যা করতে চাইছেন করে ফেলুন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদের নিয়ে সাগরের কিনারে পৌঁছে যান এবং তার মধ্যে নেমে যেতে থাকেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের মধ্য থেকে একজনও পিছু হটবে না। আপনি আমাদের নিয়ে দুশমনদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবেন, এতে আমরা মোটেই অখুশী নই। আমরা যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকবো। প্রাণপণ যুদ্ধ করবো। হয়তো আমাদের সাহায্যে আল্লাহ আপনাকে এমন কিছু দৃশ্য দেখাবেন যা দেখে আপনার

চোখ জুড়িয়ে যাবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের ওপর নির্ভর করে আপনি আমাদের নিয়ে চলেন।"

এভাবে যুদ্ধের পূর্বে তিনি সেনাদলের প্রত্যেকের মনোভাব পার্থিব স্বার্থচিন্তামুক্ত করেন। কাফেলার সম্পদ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন।

কুরাইশরা যুদ্ধ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে তাদের দল থেকে আসওয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ মাখযুমী বের হয়ে আসলো। সে একাই চ্যালেঞ্জ দিয়ে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে এগিয়ে চললো মুসলিম সেনাদলের দখলীকৃত বদর ঝরণার দিকে। এই ঝরণা থেকে সে পানি পান করবেই, এ ছিল তার প্রতিজ্ঞা। তার সামনে যে আসবে তাকে দুফাঁক করে দিয়ে সে এগিয়ে যাবে। হযরত হামযা (রাঃ) এগিয়ে গেলেন। ঝরণার কাছে পৌঁছবার আগেই তার পায়ের গোছায় দিলেন তরবারির এক কোপ। টাল সামলাতে না পেরে ধপাস করে পড়ে গিয়ে সে চারদিকে অন্ধকার দেখলো। কিন্তু তবুও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য সে মাটিতে বসে এগিয়ে চললো পানির দিকে। হযরত হামযা দ্বিতীয় আঘাত হানলো তার ওপর। এ আঘাতে তার দম বেরিয়ে গেলো।

এরপর আরবের নিয়ম অনুযায়ী কুরাইশরা মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। তাদের তিনজন শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবাজ ঘোড়সওয়ার ঢাল তরবারি নিয়ে এগিয়ে এলো। এরা তিনজন ছিল একই পরিবারের শাইবা ইবনে রাবীআহ, উতবা ইবনে রাবীআহ এবং উতবার ছেলে অলিদ। এরা বনু আবদে মান্নাফ পরিবারের সদস্য। মুসলমানদের মধ্যে থেকে সঙ্গে সঙ্গে তিনজন বের হয়ে এলেন। এরা তিনজন ছিলেন, আউফ, মুআউওয়ায ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।

কুরাইশরা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কোন গোত্রের? জবাবে যখন জানতে পারলো, এরা আনসার তখন তারা লড়াই করতে অস্বীকার করলো। তারা চায় মুহাজিরদের মধ্য থেকে তাদের সমগোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই আনসারীরা ফিরে গেলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হামযা, আবু উবায়দা ও আলীকে পাঠালেন। এরা তিনজন বনু আবদে মান্নাফের পরিবারের সন্তান। এবার কুরাইশরা মোকাবিলায় এগিয়ে এলো।

হযরত আলী অলীদের, হযরত হামযা উতবার এবং হযরত আবু উবায়দা শাইবার মোকাবিলায় এগিয়ে গেলেন। হযরত আলী ও হযরত হামযা অলিদ ও উতবাকে তখনি ধরাশায়ী করে ফেললেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা বয়োবৃদ্ধ হবার কারণে শাইবা তাঁর সাথে সমানে আক্রমণ করে অস্ত্রাঘাত করে যেতে থাকলো। তিনিও পাল্টা আস্ত্রাঘাত করলে। শাইবা সেখানেই প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হন। আলী ও হামযা মিলে তাঁকে ধরাধরি করে মুসলিম সেনাদলের মধ্যে নিয়ে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের কাছে ছিল তাঁর মাথা। সেখানেই তিনি শাহাদত বরণ করলেন। রাহমাতুল্লাহি রাহমাতান ওয়াসিআতান।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যের বাহ্যিক কারণ

একথা সত্য, বদর যুদ্ধে মুসলমান ও কাফেরদের বাহিনীর বাহ্যত কোনো তুলনা হয় না। একদিকে তিনশ'র কিছু বেশি, অন্যদিকে হাজারের বেশি। একদিকে যুদ্ধাস্ত্র নামেমাত্র বরং অনেকের হাত খালি কিন্তু অন্যদিকে সব রকমের অস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। এ অবস্থা দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মুসলমানদের জয়লাভের মূলগত কারণ কি? সাধারণত যেসব কারণে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় অনেকাংশে সেগুলো মুসলমানদের জন্য ছিলো অনুপস্থিত। আল্লাহর সাহায্যই ছিলো এখানে মূলশক্তি ও যুদ্ধে জয়লাভের প্রেরণা। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাহ্যত এমন কিছু কারণ আমরা দেখি যেগুলো যুদ্ধ জয়ে মুসলমানদের সাহায্য করেছে।

প্রথম কারণ

মুসলমানদের ছিলো একটি মজবুত আকীদা ও বিশ্বাস। একটি বিশ্বাস একটি মানুষকে শক্তি জোগায়, প্রেরণা দেয় এবং মজবুতভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে। এই সঙ্গে একটি মানবগোষ্ঠীকে একীভূত করে। অর্থাৎ এই বিশ্বাসই হয়ে ওঠে তাদের জীবনীশক্তি। ইসলাম মুসলমানদেরকে এই বিশ্বাস দান করেছিল। মুসলমানরা এমন অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে নামে যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত জোরদার। প্রত্যেকটি মুসলমান এই প্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল যে দুটি নেকীর মধ্যে একটি সে অবশ্যই

লাভ করবে। যুদ্ধে মৃত্যু হয়ে গেলে তা হবে শাহাদতের মৃত্যু, তার জন্য অবধারিত আছে জান্নাত। আর যদি বিজয় অর্জিত হয় তাহলে সে হবে গাজী, দুনিয়ার সাফল্য ও মর্যাদা সে লাভ করবে।

ঈমানের এই পোখতা-একিন মৃত্যুকে তাদের প্রেমাস্পদে পরিণত করে। কোনো সেনাবাহিনী যদি এভাবে প্রাণ উৎসর্গ করতে লালায়িত হয়, তাহলে সাফল্য তাদের পদচুম্বন করে। তাছাড়া দুনিয়ায় কোনো জুলুম প্রতিষ্ঠার জন্য তারা লড়াই করছিলো না। তারা লড়াই করছিলো সত্য-ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। তাদের চিন্তার ও বিশ্বাসের এ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা তাদের ঈমান ও আকিদাকে আরো পাকা-পোখত করে তুলেছিলো। মুসলমানরা যতোদিন যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের এ নীতি অব্যাহত রেখেছে ততোদিন বিজয় তাদের হাতের মুঠোয় অবস্থান করেছে।

অন্যদিকে, মুশরিকদের অবস্থা কি ছিলো? তাদের তো কোনো স্থির, নিশ্চিত ও সঠিক বিশ্বাস ছিলো না। কোনো পবিত্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে নামেনি। শত শত দেব-দেবী ছিলো তাদের আরাধ্য। তারা ছিলো বহুমুখী। তাদের যুদ্ধের প্রেরণা কি ছিলো? নাম, যশ, বাহাদুরী, অহংকার, গর্ব এসব ছিলো তাদের লক্ষ্য। এগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো সেনাদলের পা মজবুত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় কারণ

কুরাইশ সেনাবাহিনী প্রথমত মক্কা থেকে বের হয়েছিলো মদীনাবাসীদের হাত থেকে তাদের সিরিয়া থেকে আগমনকারী বাণিজ্য কাফেলাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে। মুসলমানদের মাথা গুঁড়িয়ে দেবার এটা একটা মহাসুযোগ। তাই তারা মুসলমানদের খতম করে দিতেই আসছিলো। বদরে এসে যখন শুনলো, কাফেলা আক্রান্ত হয়নি বরং নিরাপদে চলে যেতে পেরেছে, তখন তাদের মধ্যেই দ্বিধার সৃষ্টি হলো। একদল মত প্রকাশ করলো, আমাদের আসল উদ্দেশ্য যখন সফল হয়েছে তখন আর মুসলমানদের সাথে লড়াই করার দরকার নেই। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। লাল উটের সওয়ারী উতবা ইবনে রাবীআহ তো বলেই ছিলোঃ "মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের কারোর চাচাতো ভাই, কারোর মামাতো ভাই, আবার কারোর আপন বংশের লোক। অর্থাৎ তোমাদের সবার সাথে

তার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। তাকে হত্যা করলে লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করবে। বলবে, তোমরা নিকটাত্মীয়কে হত্যা করছো। তার চেয়ে বরং আমরা ফিরে যাই, চলো। মুহাম্মাদকে (সঃ) সমস্ত আরববাসীদের জন্য ছেড়ে দাও। তারাই তাকে দেখে নেবে।"

এভাবে তারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে একনিষ্ঠ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেনি। অন্যদিকে, মুসলমানরা বাণিজ্য কাফেলা লুট করে লাভবান হবার আশা ত্যাগ করে এ যাত্রায় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবার দৃঢ়-অঙ্গীকার করে। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাহায্যেরও অঙ্গীকার লাভ করে। ফলে তারা একমুখী হয়ে লড়াই করতে সক্ষম হয়।

তৃতীয় কারণ

মুসলমানরা যুদ্ধে নতুন পদ্ধতি ও টেকনিক অবলম্বন করে। ইতিপূর্বে আরবে এ ধরনের পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সেনাদলের প্রধান সেনাপতি। একজন সেনাপতির অধীনে মুসলমানরা যুদ্ধ করছিলো। তার একটি অঙ্গুলী হেলনে সেনাদল সামনে বাড়তো বা পেছনে সরে আসতো। মুসলিম সেনাদলে ছিলো কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলা।

অন্যদিকে, মুশরিকদের সেনাদলের কোনো একজন সেনাপতি ছিলো না। মক্কার বেশীরভাগ সরদার ছিলো সেনাদলের সাথে। তাদের সবাই ছিলো সেনাপতি। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে যার যার মতো সৈন্য পরিচালনা করে তারা কেবল বিশৃঙ্খলা বাড়াতে সাহায্য করেছিলো। দ্বিতীয়ত বদরে পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাদলকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন। বর্তমানকালে মরুযুদ্ধে এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তিনি সেনাদলের একটি অংশকে 'মুকাদ্দমাতুল জায়েশ' বা অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে নিয়োগ করেন। দ্বিতীয় একটি বড় অংশকে রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে রাখেন। তৃতীয় অংশটিকে রাখেন শেষ সেনাদল হিসেবে। এ ছাড়া শত্রু সেনাদলের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তিনি গুপ্তচর বাহিনীও নিয়োগ করেন।

যুদ্ধের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে মুসলিম সেনাদলকে তিন পর্যায়ে কাতারবন্দী করেন। অন্যদিকে, মুশরিকরা কোনো

সারিবন্দী করার ধার ধারেনি। তারা যার যার মতো সাহস ও বাহাদুরী দেখিয়ে এগিয়ে এসেছে। তাদের তীরন্দাজ বাহিনী, তরবারি ও বর্শাধারী পদাতিক বাহিনী এবং ঘোড়া সওয়ার ও উষ্ট্রী বাহিনী সবাই একই সাথে হল্লা করে এগিয়ে এসেছে।

মুসলমানরা অবিচল থাকাতে তারা পিছে হটে গেছে। তারপর নিজেদের সকল শক্তিকে একত্র করে আবার একসাথে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এভাবে নিজেদের শক্তি ও উদ্যম তারা হারাতে থেকেছে। অন্যদিকে মুসলমানরা সারিবদ্ধভাবে ছিলো। তারা সংখ্যার ভিত্তিতে কয়েক ভাগে বিভক্ত ছিলো। প্রথম সারিগুলো ছিলো বল্লমধারী সেনা। শত্রুদের অশ্ববাহিনীর গতিরোধে তারা ছিলো দক্ষ। তাদেরকে সাহায্য করেছিলো তাদের পেছনে দাঁড়ানো তীরন্দাজ বাহিনী। সামনের লাইনগুলোতে দুশমনদের হামলার মোকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখতে তারা সাহায্য করেছে। অবশিষ্ট সেনাদল সেনাপতির অধীনে ছিলো। দুশমনদের হামলা যখনই একটু নিস্তেজ হয়েছে তখনই সেনাপতির হুকুমে তারা দুশমনদের উপর বাজ পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যুদ্ধের ময়দানে একটি উঁচু জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে থেকে তিনি সমগ্র যুদ্ধের ময়দান দেখতে পাচ্ছিলেন এবং পরিচালনা করছিলেন। এখানে সা'দ ইবনে মুআযের নেতৃত্বে একটি বাহিনী তার প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত ছিলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সারিবন্দী করার কৌশল মুশরিকদেরকে বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত করেছে।

বদর যুদ্ধের প্রভাব সুদূরপ্রসারী

ইসলাম ও অন্য ধর্ম ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে পার্থক্য

ধর্মের সাথে প্রচার শব্দ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ধর্ম প্রচার করা হয়। ধর্ম সম্পর্কে এটাই সাধারণ বিশ্বাস কিন্তু ইসলাম এই প্রচলিত বিশ্বাসের একটু ব্যতিক্রম। ইসলাম শুধু প্রচার করলেই হয় না বরং প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। কারণ 'ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম'-আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং তা মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা অর্থে। আল্লাহ মানুষের পৃথিবীতে চলার এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একমাত্র ইসলামকেই মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন। আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল আল্লাহর কাছ থেকে ইসলাম ধর্মই এনেছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের উম্মতরা এই ধর্ম ত্যাগ বা বিকৃত করে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক নতুন নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করে। তাই এগুলো কেবল প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এতে তারা সন্তুষ্টও থেকেছে।

কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে এটা খাটো। কারণ ইসলাম আল্লাহর প্রণীত ও আল্লাহ প্রেরিত। মানুষকেও এই বিশ্বজগতকে আল্লাহ যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন তারই সাথে সামঞ্জস্যশীল করে আল্লাহ ইসলামের বিধান প্রণয়ন করেছেন। কাজেই ইসলামের বিধান মেনে চললে বিশ্বজগতে ও মানুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না। এছাড়া অন্য যে কোনো বিধান ও ধর্ম বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তাই আল্লাহ ইসলামের শুধু প্রচার নয়, প্রতিষ্ঠা করারও হুকুম দিয়েছেন। 'মুশরিকরা অপছন্দ করলেও অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তার রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন।'

(আত্-তওবা : ৩৩)

ইসলামকে এভাবে মানুষের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রয়োজনে জিহাদ করারও বিধান দিয়েছেন। এজন্য অন্যান্য ধর্মে জিহাদ তথা যুদ্ধ করে ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ না থাকলেও ইসলামে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম কাপুরুষদের ধর্ম নয়, সিংহ পুরুষদের ধর্ম। যে দুনিয়া এবং যে বিশ্ব একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন সেখানে আল্লাহরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তাদের নিজেদের কর্তৃত্ব নয়। তাই তারা এই দায়িত্ব পালনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কাফের ধ্বংস করা তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে কুফরীকে নির্মূল করা।

বদরের যুদ্ধ ঃ প্রথম পরীক্ষা

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের দায়িত্বশীলতার প্রথম পরীক্ষা হয়। এই যুদ্ধটি শেষ হবার পরে সমগ্র আরব উপদ্বীপে রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রই পরিবর্তিত হয়ে যায়। মুসলমানদের সামরিক শক্তির প্রভাব ও শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বিশেষ করে মক্কা, মদীনা ও আশপাশের এলাকায় তাদের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি স্বীকৃতি লাভ করে। এর মোকাবিলায় কুরাইশদের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিপত্তি, প্রতাপ, খ্যাতি ও শ্রেষ্ঠত্ব ভীষণভাবে আহত ও পর্যুদস্ত হয়। একটি যুদ্ধেই সবশেষ হয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু এই যুদ্ধের ফলাফল কুরাইশদেরকে ভীষণ ভীত, সন্ত্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত করেছিলো।

আসলে তো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এ যুদ্ধের জন্য পূর্ব থেকে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। প্রস্তুতি নেয়ার কোনো সুযোগই তাঁরা পাননি। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা বা সেনাবাহিনী দুটোর কোনো একটির মোকাবিলা তাদের করতে হচ্ছিলো। নিজেদের জনবল ও সমরাস্ত্র অতি অল্প হওয়ার কারণে তাদের বৃহত্তর অংশ বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করার পক্ষপাতি ছিলো। তারা মনে করেছিলো অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত কুরাইশদের বিশাল সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা যাবে না। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন। কুরআনের ভাষায়, "তোমরা চাচ্ছিলে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্বাধীন হোক, অন্যদিকে আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে তিনি সত্যকে তার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করবেন।" (আনফাল ঃ ৭)

আল্লাহ হক ও বাতিলকে সরাসরি সংঘর্ষের ময়দানে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন। হককে হক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে, বাতিলের উপর তাকে বিজয়ী করতে এবং বাতিলের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিনাশ করতে চাচ্ছিলেন। আল্লাহ চাচ্ছিলেন কাফেরদের কুফরীর অহংকার ধূলায় মিলিয়ে দিতে। তাদের একদল নিহত হবে, একদল হাতে পায়ে বেড়ি পরে লাঞ্ছিত বন্দীদশায় উপনীত হবে এবং তাদের শক্তি বিনষ্ট হবে। অন্যদিকে, রক্তক্ষয়ী জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের পতাকা গর্বিত মস্তকে পত্ পত্ করে উড়তে থাকবে।

একটি মুসলিম জামায়াতের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো ঃ তারা এখন যথারীতি একটি উম্মতে পরিণত হবে। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হবে। প্রতিপত্তি ও শাসন ক্ষমতা লাভ করবে। দুশমনের শক্তির সাথে তারা নিজেদের শক্তি যাচাই করবে এবং নিজেদের ঈমানী শক্তির দুশমনকে পর্যুদস্ত করবে।

তারা জানবে, বিজয় নির্ভর করে না সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল সম্ভার এবং অশ্বশক্তি ও ধনবলের উপর, বরং বান্দার দিল বিশ্ব জাহানের একমাত্র পরিচালক ও সবচেয়ে বড় শক্তির সাথে কি পরিমাণ সংযুক্ত হয়ে আছে, যে শক্তির সামনে বিশ্বের সকল শক্তিই তুচ্ছ ও নগণ্য তার প্রতি বান্দার আস্থা ও নির্ভরতা কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে, তার উপর নির্ভর করে বান্দার বিজয়। বদরে ঈমানী শক্তি ও শয়তানী শক্তির মোকাবিলা যে পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঐ পর্যায়ে পৌঁছে না যাওয়া পর্যন্ত এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে সামনে আসতো না।

বদরের যুদ্ধে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে যে, মুসলমানরা একদিকে চলতে চাচ্ছিলো, আল্লাহ তাদেরকে অন্যদিকে চালিয়ে দিলেন। মুসলমানরা একটাকে ভালো মনে করছিলো, আল্লাহ অন্যটির মধ্যে তাদের ভালো দেখিয়ে দিলেন। এভাবে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আপত ভালো দিকে না গিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং সকল দিক বিবেচনা করে একমাত্র ইসলামের কল্যাণের স্বার্থে ভালো ও করণীয় নির্ধারণ করতে হবে, অন্য কোনো জাগতিক স্বার্থে নয়। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলায় অনেক সময় আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে হয়, কিন্তু আসলে তার মধ্যেই থাকে কল্যাণ। আল্লাহ বলেন, "আসা আন তাকরিহু শাইয়ান ওয়া হুয়া

খাইরুল লাকুম ওয়া আন তুহিব্বু শাইয়ান ওয়া হুয়া শার্‌রুল লাকুন।" অর্থাৎ কোনো জিনিস তোমরা খারাপ মনে করো অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আবার কোনো জিনিস তোমরা ভালো মনে করো অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ।

মুসলমানরা আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত যদি নিজেদের ইচ্ছায় চলতো, তাহলে তারা বড় জোর একটা বাণিজ্য কাফেলার প্রচুর মালসামান ও অর্থকড়ি লাভ করতো। কিন্তু বদরের যুদ্ধে নেমে কুফরী শক্তিও মোকাবিলা করে তারা মানবেতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলো। এ বিজয় হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদ রেখা টেনে দিয়েছিলো। অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত একটি বাতিল বাহিনীর উপর প্রায় অস্ত্রবিহীন একটি হক ও সত্য বাহিনী বিজয় লাভ করেছিলো। এটা ছিলো এমন একটি বাহিনীর বিজয় যাদের সম্পর্কে আল্লাহর সাথে মজবুতভাবে গড়ে ওঠেছিলো, যারা ব্যক্তি স্বার্থকে কোনো প্রাকার প্রাধান্য দেয়নি। যারা একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে কোন প্রকার প্রতারণা ও কূটকৌশল অবলম্বন না করে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিলো। নিজেদের ঈমান ও একিনের বদৌলতে তারা চূড়ান্ত বিজয় লাভে সক্ষম হয়েছিলো।

এ যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য জয় ও পরাজয়ের একটি বিধান লিখে দিয়ে গেছে। মুসলমানদের ও ইসলামের বিজয় এ বিধানের বাইরে সম্ভবপর নয়।

প্রথম যুগের নবী হযরত ইদরীস (আঃ)

হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম আল্লাহর একজন বড় নবী ছিলেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত নূহ (আঃ) পর্যন্ত মানব ইতিহাসের যে সূচনাকাল ও প্রথম যুগটি অতিক্রান্ত হয়েছে, তাঁর অবস্থান ছিলো সেই যুগে।

কুরআন মজীদে দু'জায়গায় তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে। সূরা মারয়ামের ৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "স্মরণ করো এই কিতাবে উল্লেখিত ইদরীসের কথা, সে ছিলো সত্যনিষ্ঠ নবী।" সূরা আম্বিয়ার ৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং স্মরণ করো ইসমাঈল, ইদরিস্ ও যুলফিকর-এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিলো ধৈর্যশীল।"

তবে হযরত ইদরীসের (আঃ) সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে হযরত নূহের (আঃ) পরবর্তীকালের ইসরাইলী নবী বলেও মনে করেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, তাঁর সময়কাল ছিলো হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পূর্বে। বাইবেলের বর্ণনার ভিত্তিতে এসব মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কোনো সহীহ হাদীস থেকে এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

কুরআনের ভাষ্যকারদের অধিকাংশের মতে, বাইবেলে যাঁকে 'হনোক' বলা হয়েছে, তিনিই হচ্ছেন হযরত ইদরীস (আঃ)। বাইবেলে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "হনোক পঁয়ষট্রি বছর বয়সে মথুশেলহের জন্ম দিলেন। মথুশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক তিনশত বছর ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করিলেন এবং আরো পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন। সর্বশুদ্ধ হনোক তিনশত পঁয়ষট্রি বছর রহিলেন। হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।" (আদি পুস্তক ৫ ঃ ২১-২৪)

তালমুদের ইসরাইলী বর্ণনাগুলোতে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, হযরত নূহের (আঃ) পূর্বে মানব জাতির মধ্যে গোমরাহী পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলো। হনোক তখন জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্ত নির্জনে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল ছিলেন। আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতারা এসে তাঁকে বললেন, "হে হনোক! উঠুন, নির্জনতা থেকে বের হয়ে আসুন এবং জমিনের বাসিন্দাদের মধ্যে চলাফেরা করে তাদেরকে পথ দেখান যার ওপর তাদের চলা উচিত। তাদেরকে এমন পথের সন্ধান দিন যার ওপর তাদের আমল করা উচিত। এ হুকুম পেয়ে তিনি বের হলেন। বিভিন্ন স্থানে লোকদের জমায়েত করে ওয়াজ-নসিহত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন। মানব গোষ্ঠী তাঁর আনুগত্য করে আল্লাহর বন্দেগী করলো। হনোক ৩৫৩ বছর পর্যন্ত মানব গোষ্ঠী শাসন করলেন। তার শাসন ছিলো ইনসাফ ও সত্যপরায়ণতার শাসন। তার শাসনকালে জমিনে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতো।

বুখারী ও মুসলিমের মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসে কেবল এতোটুকুই বলা হয়েছে যে, নবী (সাঃ)-এর সাথে চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আঃ)-

এর দেখা হয়। সূরা মারয়ামের ৫৭ আয়াতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আর তাঁকে আমি উঠিয়েছি উচ্চ স্থানে।" এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সাহাবী হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) যে বক্তব্য পেশ করেন আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন। হযরত কা'ব বলেন, আল্লাহ একবার হযরত ইদরীসের (আঃ) প্রতি এই মর্মে অহী নাযিল করেন যে, "হে ইদরীস! সমস্ত দুনিয়াবাসী প্রতিদিন যে পরিমাণ সৎ কাজ করবে সে সবের সমপরিমাণ সওয়াব তোমাকে প্রতিদিন দেয়া হবে।" এ ঘোষণা শোনার পর হযরত ইদরীসের মনে প্রতিদিন আরো বেশি সৎকাজ করার বাসনা জাগলো। এ জন্য তাঁর মনে ইচ্ছা জাগলো যে, তাঁর বয়স আরো দীর্ঘ হলে ভালো হতো। আল্লাহর অহী এবং তার মনের এই বাসনা এক সহায়তাদানকারী ফেরেশতার কাছে প্রকাশ করে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে মউতের ফেরেশতার সাথে আলাপ করে আমাকে আরো বেশি সৎকাজ করার সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করো। সে ফেরেশতা একথা শুনে হযরত ইদরীসকে নিজের ডানার উপর বসিয়ে আকাশে উড়াল দিলো। তারা যখন চতুর্থ আসমান অতিক্রম করছিলেন, তখন মউতের ফেরেশতা জমিনের দিকে নামছিলো। সেখানে উভয়ে মুখোমুখি হলো। বন্ধু ফেরেশতা মউতের ফেরেশতার সাথে হযরত ইদরীসের ব্যাপারে আলোচনা করলো। মউতের ফেরেশতা জিজ্ঞস করলো, হযরত ইদরীস কোথায়? সে বললো, আমার ডানায় বসে আছেন। মউতের ফেরেশতা বলতে লাগলো, আল্লাহর দরবার থেকে এ হুকুম নাযিল হয়েছে যে, চতুর্থ আসমানে ইদরীসের জান কবয করো। তাই আমি অত্যন্ত অবাক হয়েছিলাম এবং পেরেশানও হয়ে পড়েছিলাম যে এটা কেমন করে সম্ভব, ইদরীস তো আছেন জমীনে? তখনই মউতের ফেরেশতা হযরত ইদরীস (আঃ)-এর জান কবয করলো। এ বক্তব্য পেশ করে হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) বলেন, এটিই হচ্ছে "তাকে আমি উচ্চস্থানে উঠিয়েছি" আয়াতের অর্থ। ইবনে জারীর তাবারীর মতো ইবনে আবী হাতেম ও তাঁর তাফসীরে একই বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর তার তাফসিরে এগুলোকে ইসরাইলী বর্ণনা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হযরত ইদরীসের (আঃ) অবস্থান কোথায় ছিলো এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক দলের মতে, তিনি মিসরের মানাফ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য দলের মতে, তার জন্ম ব্যাবিলনে। সেখানেই তিনি বয়োঃপ্রাপ্ত হন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি হযরত শীশ আলাইহিস সালামের সাহচর্য লাভ করেন। বয়োঃপ্রাপ্ত হবার পর আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করেন। তিনি পথভ্রষ্টদের মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতে থাকেন কিন্তু অধিকাংশ লোক তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। কমসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে তার শরীয়তের আনুগত্য করে। ব্যাবিলনের লোকদের বিরোধিতার কারণে তিনি মুষ্টিমেয় মুসলমানদের নিয়ে মিসরে হিজরত করে নীলের অববাহিকায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং 'আমার বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের' দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াও হযরত ইদরীস (আঃ) মুসলমানদেরকে সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন বিধান শিক্ষা দেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে লোক বাছাই করে তাদেরকে সরাসরি শিক্ষাদান করেন। শিক্ষাকাল সমাপ্ত হবার পর তাদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এবং বিভিন্ন জনবসতিতে পাঠিয়ে দেন। এভাবে তিনি গ্রামীণ ও শহর জীবনে একটি সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলেন।

বলা হয়ে থাকে, তাঁর কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁর শিষ্যবর্গ যেসব সুসভ্য জনবসতি গড়ে তোলেন, তার সংখ্যা দু'শতেরও বেশি। হযরত ইদরীস (আঃ) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। তাঁর আমলে এর চর্চা ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, আবর্তন, আকর্ষণ, বিকর্ষন, গঠন প্রকৃতি ইত্যাদি জ্ঞানচর্চা সে যুগে প্রসার লাভ করে।

মানব ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর অবস্থান। তিনি সভ্যতার একজন নির্মাতাও। তদানীন্তন বিশ্ব জনবসতির একটি বিরাট অংশ তিনি পরিভ্রমণ করেন। তারপরে এবং নূহের প্লাবনের পরে যে বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এমনই একজন নবী ছিলেন যিনি বিশ্ব জনবসতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিভ্রমণ করেছিলেন।

হযরত আরকাম (রাঃ) তাঁর বাসগৃহ ওয়াক্ফ করে দিলেন

হযরত আরকাম ইবনে আবুল আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্টতা এদিক দিয়ে যে ইসলামের একেবারে প্রথম পর্যায়ে যখন ইসলামী আকীদা, বিশ্বাস, নির্মাণ ও চারিত্রিক অনুশীলনের কাজ চলছিল অতি সংগোপনে তখন তিনিই ছিলেন এর প্রথম সহায়তাকারী। সকল প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র তাঁর বাসস্থানেই গড়ে ওঠেছিল।

নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর ইসলামের দাওয়াত দেবার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করতে থাকেন। হাতেগোনা গুটিকয় লোক তখন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে। তারা গোপনে গোপনে নিজেদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে তাদের দাওয়াত ছড়াবার ব্যবস্থা করে। নওমুসলমানরা তখন লুকিয়ে লুকিয়ে বিভিন্ন উপত্যকায়, পাহাড়ে-পর্বতে নিজেদের ইবাদত বন্দেগী করতো। নামায তখনো ফরয হয়নি, তা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের পরপরই একজন মুসলমান তার অন্য সকল দেবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রমাণস্বরূপ নামাযে মশগুল হতো। আর এটা ছিল মুশরিকদের দেবতা ভজনের রীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বিশিষ্টতার কারণে কোথাও কোন উপত্যকায় কখনো মুসলমানের নামায মুশরিকদের চোখে পড়ে যায়। তাদের মধ্যে এর আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এমনকি দু'এক জায়গায় নামাযরত মুসলমানের ওপর মুশরিকরা আক্রমণও করে বসে। এর ফলে মুশরিকদের সাথে বড় রকমের সংঘর্ষের আশংকা দেখা দেয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কোনো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে চাচ্ছিলেন না। এ জন্য তিনি কোনো সংরক্ষিত স্থানের সন্ধানে ছিলেন যেখানে কাফেরদের হামলার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ সময় সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী সতের-আঠার বছরের উঠতি যুবক হযরত আরকাম ইবনে আবুল আরকাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গীত হোন। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আমার প্রশস্ত হাবেলী আছে, কাবাঘর থেকেও বেশি দূরে নয়, এটা আমি আপনার জন্য উৎসর্গ করছি। মুসলমানরা এর মধ্যে একত্র হয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে। এর ভেতরে প্রবেশ করার ক্ষমতা মুশরিকদের নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ দান গ্রহণ করলেন। এখানেই ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্র গড়ে তুললেন।

হযরত আরকাম ইবনে আবুল আরকাম বনু মাখযূমের সাথে সম্পর্কিত। মাখযূম গোত্র কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। জাহেলী যুগে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ও সেনা ক্যাম্প পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব এই গোত্রের হাতেই ন্যস্ত থাকতো। তাঁর দাদা আবু জুনদুব সমকালীন মক্কার শ্রেষ্ঠ রইসদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) ও হযরত খালেদ সাইফুল্লাহর (রাঃ) দাদা ছিলেন।

হযরত আরকাম (রাঃ) প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। সীরাত লেখকগণের কেউ কেউ তাঁকে সপ্তম আবার কেউ কেউ একাদশ ও দ্বাদশতম ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে আছীর 'উসুদুল গাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "তিনি হযরত আবু সালমাহ ইবনে আবদুল আসাদ (রাঃ), হযরত উবাইদাহ ইবনুল হারেছ (রাঃ) ও হযরত উসমান ইবনে মাযঊনের (রাঃ) সাথে এক সংগে ঈমান এনেছিলেন।" সীরাত গ্রন্থগুলোতে তাঁর জন্ম তারিখের সঠিক উল্লেখ না থাকলেও বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায়, হিজরতে নববীর পূর্বে ৫৯৪ ঈসায়ী সনে তাঁর জন্ম হয়। এই হিসেবে ৬১১ ঈসায়ী সনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করেন তখন তিনি ছিলেন সতের বছরের যুবক। ধারণা করা হয় নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরের মধ্যে সতের কি আঠার বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বয়সে ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রের যাবতীয় দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে সমগ্র মুশরিক, কাফের ও ইহুদী সমাজের ক্রোধের মোকাবিলা করা চাট্টিখানি কথা নয়। হযরত আরকাম ইবনে আবুল আরকাম এটা করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি

ঈমান এনেছিলেন। তিনি আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তাতে নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করেছিলেন। নবুওয়াতের সপ্তম বছরে শিআবে আবু তালেব তথা আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণ থাকার পূর্ব পর্যন্ত এই 'দারে আরকাম'ই ছিল ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কেন্দ্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 'দারে আরকামে' অবস্থান করতেন এবং এখানেই ইসলামী জামাআতের সদস্যরা এসে তাঁর সাথে মিলিত হতেন। তাদের নতুন আগ্রহী সাথী ও বন্ধুদেরকে ইসলাম গ্রহণ করাবার জন্য এখানে আনতেন। এখানে নিজেদের ইবাদত বন্দেগী করতেন।

তবে নবুওয়াতের চতুর্থ বছর থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেবার ঘোষণা আসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হয়ে প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে এবং ঘরে-ঘরে গিয়ে দাওয়াত দিতে লাগলেন। তখন বিরোধিতা প্রচন্ড রূপ নিল। এ বিরোধিতার উত্তালতরঙ্গ ভেদ করে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে আরবের অতুলনীয় বীর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর মাত্র তিনদিন কি তিন মাস পরে একদিন হযরত হামযা আল্লাহর নবীর (সাঃ) সাথে দারে আরকামে বসেছিলেন। এমন সময় খোলা তরবারি হাতে উমর ইবনুল খাত্তাব সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। এভাবে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রাঃ) সমস্ত মুসলমানদের সাথে নিয়ে দারে আরকাম থেকে বের হয়ে বায়তুল্লায় চলে আসেন এবং প্রকাশ্যে একসাথে নামাজ পড়েন।

তারপর মুশরিকদের আক্রমণ ও বিরোধিতার মোকাবিলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আরকামও তাঁর সাথে হিজরত করেন। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় তাতে হযরত আরকামকে (রাঃ) হযরত আবু তালহা যায়েদ ইবনে সাহল আনসারীর (রাঃ) সাথে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গৃহ নির্মাণের জন্য মদীনার বনী যারীক মহল্লায় এক টুকরা জমি দান করেন।

হিজরী দ্বিতীয় সন থেকে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হয়। হযরত আরকাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর, ওহোদ, আহযাব, খয়বর, হোনায়েন ইত্যাদি প্রত্যেকটি যুদ্ধে শামিল হন।

হযরত আরকামকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত কালেক্টরের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং এ দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সাথে পালন করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আরকাম (রাঃ) বিয়াল্লিশ বা এক বর্ণনা মতে চুয়াল্লিশ বছর পরে ৫৩ বা ৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসিয়াত অনুযায়ী বিখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

হযরত আরকাম তাঁর বাসস্থানটি ইসলামের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এটি তাঁর পরিবারের লোকদের হাতে চলে যায়। এর মধ্যে একটি মসজিদও ছিল। বাসস্থানটি ছিল কাবাঘরের অনতিদূরে। যারা সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করতেন এ বাসস্থানের দ্বারদেশের সামনে দিয়ে তাদের যেতো হতো। ১৪০ হিজরীতে আব্বাসী বাদশাহ মনসুর বিপুল অর্থের বিনিময়ে এটি হযরত আরকামের নাতি আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ও অন্যান্য ওয়ারিসদের নিকট থেকে কিনে নেন। পরে এটা বাদশাহ মেহদীর ক্রীতদাসীর হাতে চলে যায়। সে বিপুল অর্থ ব্যয়ে এর পুনঃনির্মাণ করে। কিন্তু দারে আরকামের পবিত্র নামে এটি সবসময় পরিচিত হয়ে এসেছে। বর্তমানে এটি পবিত্র হারাম শরীফের অন্তর্ভুক্ত এবং তার অংশে পরিণত হয়েছে।

আদর্শের প্রতীক সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব

তখনো সাহাবীদের যুগ শেষ হয়নি। প্রবীণ তাবেয়ীদের মধ্যে মদীনার শ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকিহ ছিলেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মদীনার গভর্ণর ছিলেন উমর ইবনে আবদুল আযিয (রঃ)। এ সময় মসজিদে নববীর মেরামত ও সম্প্রসারণের কাজ শেষ হবার পর উমাইয়া বাদশাহ অলিদ মদীনায় এলেন। তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। বাদশাহর আগমন উপলক্ষে এর আগেই

সাধারণ লোকদের থেকে মসজিদ খালি করানো হয়েছিলো। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবও মসজিদের এককোণে বসেছিলেন। সরকারী কর্মচারীরা কেউ তাঁকে উঠাবার সাহস পেলো না। একজন কেবল তাঁকে এতটুকুন বললো ঃ "এ সময় যদি আপনি সরে যেতেন তাহলে ভালো হতো।"

"আমার উঠার যখন সময় হবে তখনই আমি উঠবো, তার আগে উঠবো না।" সাঈদ জবাব দিলেন।

"ঠিক আছে, তাহলে আমিরুল মুমিনিন যখন এদিক দিয়ে যাবেন তখন দাঁড়িয়ে সালাম দেবেন।"

"আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য উঠে দাঁড়াতে পারবো না।" মদীনার গভর্ণর উমর ইবনে আবদুল আযিয বাদশাহর সঙ্গে ছিলেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উচ্চ ইলমী মর্যাদা, সত্যনিষ্ঠা ও স্বভাবজাত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিফ ছিলেন। তিনি বাদশাহকে মসজিদের অন্যান্য অংশ ঘুরেফিরে দেখাচ্ছিলেন কিন্তু যে অংশে সাঈদ ছিলেন সেদিকটা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ নিজেই যখন কিবলার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন তখন সাঈদ তার নজরে পড়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কে এই শাইখ?" আবার নিজেই জবাব দিলেন ঃ "সাঈদ মনে হচ্ছে।"

উমর ইবনে আবদুল আযিয বললেন ঃ জ্বি হ্যাঁ, সাঈদই। তারপর তাঁর পক্ষ থেকে নিজেই ওজর পেশ করে বললেন ঃ "সাঈদ অনেক বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। চোখেও ভালো দেখেন না। আপনাকে চিনতে পারলে হয়তো সালাম দেবার জন্য দাঁড়াতেন।"

"হ্যাঁ আমি তাঁর অবস্থা ভালোভাবেই জানি"। অলিদ বললেন, ঘুরেফিরে বাদশাহ তাঁর কাছেই এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "শাইখ কেমন আছেন?"

"আলহামদুলিল্লাহ, ভালোই আছি।" সাঈদ বসে-বসেই জবাব দিলেন। সৌজন্যের খাতিরে বাদশাহ'র স্বাস্থ্যেরও খোঁজ-খবর নিলেন।

"ইনি হচ্ছেন পুরানো যুগের স্মৃতি," একথা বলতে বলতে অলিদ ফিরে গেলেন।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নৃশংসতার কাহিনী সবাই জানে। একদিন হাজ্জাজ অতি দ্রুত নামাযের রুকু-সিজদা করছিলেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব যখন তাকে মুরগির মতো ঠোকর মারতে দেখলেন তখন একমুঠো কাঁকর নিয়ে তার গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। হাজ্জাজের নামাযের গতি ধীর হয়ে গেলো এবং আস্তে আস্তে নামায শেষ করলেন। সালাম ফেরার পর সবাই মনে করলো এবার বুঝি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু না, হাজ্জাজ রেশমের মতো নরম হয়ে গিয়েছিলেন। তার হাতে উম্মতে মুসলিমার বড় বড় মনীষীর মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়েছে। কথায় কথায় হত্যাকান্ড ঘটিয়েছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবকে আল্লাহ তার হাত থেকে সংরক্ষণ করলেন। হাজ্জাজ নিজেই বলতেন ঃ সাঈদ আমার নামায সংশোধন করে দিয়েছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব কেবল ইলমের দিক দিয়ে তুলনাবিহীন ছিলেন না। তাকওয়া ও খোদাভীতিতেও তাঁর নজির ছিল না। নিয়মিত জামায়াতের সাথে নামায পড়তেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে এ নিয়ম মেনে চলতেন। মসজিদে নববী যেন তাঁর দ্বিতীয় গৃহ ছিল। দিবারাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যপনা এবং যিকির-ফিকিরে মশগুল থাকতেন। অত্যন্ত কঠিন অবস্থাতেও তিনি মসজিদের পথ ছাড়তেন না।

মদীনা মুনাওয়ারায় সবচেয়ে কঠিন ছিল যখন মদীনাবাসীরা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের (রাঃ) সমর্থনে ইয়াযীদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তাদের সেনানায়ক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাহ (রাঃ)। এর ফলে সংঘটিত হয়েছিল হিররা-এর বিয়োগান্ত ঘটনা। ইয়াযীদের সৈন্যরা একাদিক্রমে তিনদিন ধরে মদিনায় হত্যাকান্ড ও লুটতরাজ চালালো। কোনো একটি গৃহ এমন ছিল না যা তাদের নিপীড়ন থেকে রেহাই পেয়েছিল। অসংখ্য মানুষ তাদের তলোয়ারের আঘাতে জীবন দিয়েছিল। অবশিষ্ট লোকেরা গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল অথবা পালিয়ে প্রাণ ও মান-ইজ্জত বাঁচিয়েছিল। একজনও ঘরের বাইরে পা ফেলার সাহস করেনি। মসজিদগুলো খাঁ খাঁ করছিল। সেখানে না ছিল কোনো নামাযী, না ছিল কোনো মুয়াজ্জিন। এমনি কঠিন ও ভয়াবহ দিনগুলোতেও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায পড়তেন। বনি উমাইয়ার লোকেরা পেছনে থেকে টিককারী দিতো হো হো, দ্যাখো, পাগল যাচ্ছে!

সারারাত তিনি জেগেই কাটিয়ে দিতেন। নিশুতি রাতে যখন সমস্ত বিশ্বচরাচর ঘুমে অচেতন তখন নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ অন্যায়, অসত্য ও বদআমলের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। তোকে সেই উটের মতো নাকাল করে ছাড়বো, যে সফরে সফরে বোঝা বহন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর চলতে পারছে না, পা টলে টলে টেনে হেঁচড়ে চলছে। এই বলে তাহাজ্জুদে মশগুল হয়ে পড়তেন এবং ফজর হওয়া পর্যন্ত নামায পড়েই যেতেন। রোযাও প্রায়ই রাখতেন। প্রায় প্রতি বছর হজ্জ করতেন। সফরে থাকেন বা গৃহে অবস্থান করেন সব সময়ই কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

অভ্যাস, স্বভাব-প্রকৃতি ও চরিত্রে তিনি সাহাবায়ে কেরামের নমুনা ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সাঈদকে দেখতেন তাহলে খুশী হতেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ছিলেন বড়ই কোমল স্বভাবের এবং আপোসপ্রিয়। ঝগড়া-ঝাঁটিকে ঘৃণা করতেন। এই স্বভাবের কারণে নিজের যুগের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নিরপেক্ষ থাকতেন। ফলে সবসময় ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার নিপীড়নের শিকারে পরিণত হতেন। শরীয়তের আনুগত্যের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর, কঠোর ও আপোসহীন। গুনাহের ওপর থেকে পরদা উঠিয়ে দেয়া তিনি পছন্দ করতেন না। ইবনে হারমালাহ বলেন ঃ একদিন আমি অতি প্রত্যুষে ঘর থেকে বের হলাম। এক ব্যক্তিকে দেখলাম নেশায় অঘোর হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। তাকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে এলাম এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে কাযীর আদালতে সোপর্দ করবো? তার ওপর শরীয়তের হদ জারি হওয়া উচিত। সাঈদ জবাব দিলেন ঃ "তুমি যদি তোমার কাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে পারো তাহলে ঢেকে দাও।" ঘরে ফিরে এসে দেখলাম তার হুশ ফিরে এসেছে। আমাকে দেখেই সে লজ্জিত হলো। আমি তাকে বললাম ঃ "তোমার লজ্জা নেই? সকালে এই অবস্থায় যদি পাকড়াও হতে তাহলে তোমার পরিণতি কি হতো? তোমার ওপর শরীয়তের হদ জারি হয়ে যেতো। মুসলমানদের চোখে তুমি হেয়প্রতিপন্ন হতে। তুমি একটি জীবন্ত লাশে পরিণত হতে। তোমার সাক্ষ্য

গ্রহণ করা হতো না।" আমার কথা শুনে সে ব্যক্তি বললো ঃ "আল্লাহর কসম! ভবিষ্যতে আর কোনোদিন আমি নেশা করবো না।" কাজেই সে চিরকালের জন্য তওবা করলো।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ছিলেন যেমন ত্যাগী, তেমনি বিনয়ী ও গরীব-মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ধন-দৌলত ও পার্থিব জাঁক-জমক তাঁর কাছে একটা তৃণখন্ডের চাইতে বেশি মূল্যবান ছিল না। মানুষের দীন-ঈমান-চরিত্রই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। তাঁর একটি কন্যা ছিল বড়ই সুন্দরী, মার্জিতা, রুচিশীলা, সদালাপী, উচ্চ শিক্ষিতা ও সৎকর্ম পরায়ণ। বাদশাহ আবদুল মালেক তাকে যুবরাজের সাথে বিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন। কিন্তু সাঈদ অস্বীকার করলেন। আবদুল মালেক চাপ সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ইবনুল মুসাইয়েব তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি কুরাইশদের এক মামুলী ও গরীব যুবক আবদুল্লাহ ইবনে দাওয়াআর সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে দাওয়াআ প্রায়ই ইবনে মুসাইয়েবের মজলিসে শরীক হতেন। একবার আবদুল্লাহ কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকলেন। তারপর যখন হাজির হলেন তখন দেখা গেলো তার চেহারা বড়ই মলিন ও বেদনাকাতর।

জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ! ব্যাপার কি? এতদিন কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে?

"আমার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন, তাই আসতে পারিনি।"

"আমাকে খবর দিলে না কেন? আমিও জানাযায় শরীক হতাম। আবদুল্লাহ তুমি যুবক মানুষ, আবার বিয়ে করো।

"আমি গরীব, কে আমাকে মেয়ে দেবে?"

"আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দেবো।"

আবদুল্লাহ কিছুটা লজ্জায় এবং কিছুটা বিনয়ে চুপ করে রইলেন।

"চুপ করে রইলে কেন?"

"আপনার মেহেরবাণী ও ঔদার্য"।

"ওঠো, আনসারদের কয়েকজনকে ডেকে আনো।"

আবদুল্লাহ তাঁর হুকুম তামিল করলেন। বাদশাহর পুত্রের সাথে যিনি নিজের কন্যার বিয়ে দিলেন না তিনি একজন গরীব সহায় সম্বলহীন কুরাইশ যুবকের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি নিজেই তাঁর কন্যাকে আবদুল্লাহর গৃহে রেখে আসলেন। মদীনার ফকিহ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ছিলেন একজন আদর্শ মুসলমান।

ত্যাগীর কাছে পরাজিত জালেম

ইসলাম দুনিয়ার বুকে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কুরআনে যেমন ন্যায় প্রতিষ্ঠার হুকুম দেয়া হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দশ বছরের মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনামলে ঠিক তেমনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো পর্যায়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। বংশ মর্যাদা বা অন্য কোনো কারণে কারোর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্বও করেননি। বরং একপর্যায়ে বলেছেন, অমুক গোত্রের মেয়ে ফাতেমা না হয়ে যদি আমার মেয়ে ফাতেমা এ অপরাধ করতো তাহলে তাকেও প্রাপ্য শাস্তি দিতাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনও এ পরিপূর্ণ ন্যায়নীতি অবলম্বন করেন। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় জুলুমকে তারা সামান্যতমও অনুপ্রবেশ করার সুযোগ দেননি। নবুয়াত ভিত্তিক খিলাফতের পরে যখন ব্যক্তিভিত্তিক এবং বংশানক্রমিক রাজতান্ত্রিক শাসনধারার সূচনা হলো তখন রাষ্ট্রব্যবস্থা অন্যায় ও জুলুমের অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হলো। উমাইয়া রাজবংশ শুরু থেকেই এ জুলুমের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। তাই এই শাসন ব্যবস্থায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ন্যায় জালেম ও নিপীড়ক গভর্ণরের উত্থান সম্ভবপর হয়েছিলো।

ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছাকাফী ইব্রাহীম ইবনে ইয়াজিদ নাখয়ীর সন্ধান করছিলেন। ইব্রাহীম নাখয়ী ছিলেন ইলম ও জ্ঞানের মহাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং কুফার শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী মুহাদ্দিস। কথা বলায় তাঁর জুড়ি ছিলো না। তিনি সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করতেন। হাজ্জাজ তাঁকে শাসনদন্ডের এক নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত করলেন। ইব্রাহীমের রক্তে হাত রঞ্জিত করার জন্য তিনি পাগল হয়ে ওঠলেন।

ওদিকে ইব্রাহীম নাখয়ী হাজ্জাজের জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ করে যেতে লাগলেন। তার মতে হাজ্জাজের ওপর লানত বর্ষণ করলেও কোন ক্ষতি নেই। একদিন তার মজলিসে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন হাজ্জাজের প্রতি লানত বর্ষণ করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? জবাব দিলেন, আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলেছেন "আলা লা'সাতুল্লাহি আলায যালেমীন" সাবধান, জালেমদের প্রতি আল্লাহর লানত।

হাজ্জাজের জুলুমের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আশআছ যখন বিদ্রোহ করলেন তখন অন্য অনেক তাবেয়ী, উলামা ও সত্যনিষ্ঠদের সাথে ইব্রাহীম নাখয়ীও তাঁকে সমর্থন দিলেন। কাজেই হাজ্জাজ তাঁকে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। হাজ্জাজের পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী এবং অধীনস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ীকে ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় অনুসন্ধান করে ফিরতে লাগলো।

রাতের আঁধার তখন সমগ্র কুফা নগরীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ তাইমী তখনও ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল ছিলেন। ইলম ও জ্ঞান-গরিমার দিক দিয়ে ইব্রাহীম তাইমী তেমন কোনো আলোচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া ও ইবাদত গুজারীর ক্ষেত্রে তাঁর নজির ছিল না। মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তাকবীরে উলায় তিনি সবসময় শামিল হয়েছেন। কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এ ব্যাপারে গাফলতিকে তিনি মুসলমানের দ্বীনী জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর গণ্য করতেন। বলতেন, যে ব্যক্তি তাকবীরে উলা ধরার ব্যাপারে গাফলতি করে তার দ্বীনী জীবনের ব্যাপারে আর কোনো আশা নেই।

নামাযের জন্য দাঁড়ালে দুনিয়ার সবকিছ ভুলে যেতেন। সিজদায় গিয়ে এমনভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন যে মাথায় পাখি উড়ে এসে বসতো এবং ঠোকর মারতো। কিন্তু তার কোনো অনুভূতি থাকতো না। লাগাতার দু'মাস রোযা রাখতেন এবং প্রতিদিন মাত্র আঙ্গুরের একটি দানা খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। এহেন নেকী, তাকওয়া ও ইবাদত-বন্দেগীর পরও নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করতেন। আখেরাতের ভয়ে সর্বদা ভীত হতেন। বলতেন, কি জানি, আল্লাহর কাছে আমি মিথ্যুক, রিয়াকার ও প্রদর্শনকারী হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে যাই।

ইব্রাহীম তাইমীর চরিত্রের আর একটি চমৎকার দিক ছিল। তিনি ছিলেন ত্যাগ, কুরবানী ও অন্যের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার ব্যাপারে এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। অন্যের আরামের জন্য নিজে কষ্ট করতে দ্বিধা করতেন না। প্রত্যেক ব্যাপারে নিজের মুখের গ্রাস অন্যকে দিয়ে নিজে অভুক্ত থাকতেন।

ইব্রাহীম নিজের মহল্লার মসজিদের এক কোণে বসে তাঁর রবের বন্দেগীতে মশগুল ছিলেন। এমন সময় হাজ্জাজের সিপাহী সেখানে পৌঁছে গেলেন। ইব্রাহীম নামায পড়ছিলেন। সালাম ফিরতেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো- "তোমার নাম ইব্রাহীম?" "হাঁ, আমি ইব্রাহীম।" "তোমার পিতার নাম?" "ইয়াযীদ।"

সিপাহী চমকে উঠলো। " ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ?...... শেষ পর্যন্ত তোমাকে ধরেই ফেলেছি।" চিৎকার করে ওঠলো পুলিশ অফিসারটি, "আমাদের হাত থেকে বাঁচোয়া নেই। পাতালে গিয়ে লুকিয়ে থাকলে সেখানে থেকেও খুঁজে বের করে নিয়ে আসতাম।" তার অট্টহাসিতে মসজিদ গম গম করে ওঠলো।

ইব্রাহীম ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। পুলিশের লোকেরা তাঁকে ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ী মনে করেছে। তিনি জানতেন, হাজ্জাজ ইব্রাহীম নাখয়ীকে হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে ওঠেছেন। তিনি চুপ করে থাকলেন। কোনো কথা বললেন না। এভাবে যদি একজন বিজ্ঞ আলেম, মুহাদ্দিস ও ফকীহর জীবন রক্ষা হয় তাহলে এ তো তার জন্য পরম সৌভাগ্যের কথা!

ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ তাইমীকে গ্রেফতার করে হাজ্জাজের সামনে পেশ করা হলো। হাজ্জাজ কোনো প্রকার অনুসন্ধান না চালিয়েই তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। মৃত্যুদণ্ডের আসামীদের রাখার জন্য হাজ্জাজ এ কারাগার তৈরী করেছিলেন। শীত-গ্রীষ্ম, বৃষ্টি-বাদল, রোদ-তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই সেখানে ছিল না। এখানে একবার যে পৌঁছে যেতো, মৃত্যুর পূর্বে তার দেহ পিঞ্জর আর এখান থেকে বের হতে পারতো না।

ইব্রাহীম তাইমীর মা কেমনভাবে জানতে পারেন, তার ছেলেকে ইব্রাহীম নাখয়ী মনে করে হাজ্জাজের লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে। মৃত্যুর

অপেক্ষায় এখন সে কারাগারে দিন গুণছে। মা তার সাথে দেখা করতে গেলেন। কিন্তু ছেলেকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছিলো। ক'দিনেই শুকিয়ে হাড্ডি হয়ে গেছে। ছেলের অবস্থা দেখে মা কাঁদতে থাকলেন।

"বাবা তুমি কেন বললে না যে তোমরা যে ইব্রাহীমের খোঁজ করছো আমি সে ইব্রাহীম নই?"

"আম্মাজান! নাখয়ী হচ্ছেন ইলম ও আমলের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার আলোকে আরও হাজার গ্রহ-তারা আলোকিত হবে। জুলুম ও নিপীড়নের অস্ত্রের ঝনঝনানিতে তার আলোর শিখা নিভিয়ে দেয়া ঠিক নয়।

ইব্রাহীমের জীবন মিল্লাতে ইসলামিয়ার মহাসম্পদ। লুটেরাদের হাতে তাকে লুণ্ঠিত হতে দেয়া যায় না। আমার জীবনের বিনিময়ে যদি মিল্লাতের ইলম ও আমলের এ মহাসম্পদ সংরক্ষিত হতে পারে তাহলে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার জন্য আর কী হতে পারে!"

"হ্যাঁ, ইব্রাহীম নাখয়ী মিল্লাতের মহামূল্য সম্পদ। অবশ্যই তাঁর গায়ে যাতে আঘাত না লাগে সে ব্যবস্থা করতে হবে। বেটা! আল্লাহ তোমার ত্যাগ কবুল করুন। আমাকে অবশ্যই সবরকারী পাবে।" মা স্বচ্ছ কণ্ঠে বলে গেলেন।

তবে মৃত্যুদন্ড দেবার আগেই কারাগারের দুর্বিষহ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ইব্রাহীম তাইমী এক রাতে হাজ্জাজের কারাগার ও জীবনের কারাগার উভয়ের হাত থেকে মুক্তি লাভ করলেন। সে রাতেই হাজ্জাজ স্বপ্ন দেখলেন, কেউ বলছেঃ "আজ শহরে একজন জান্নাতী মারা গেছে।" সকালে উঠে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, কারাগারে ইব্রাহীমের মৃত্যু হয়েছে। জালেম চিৎকার করে ওঠলো, এ স্বপ্ন নিছক শয়তানের ওসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জালেম এভাবে তার আত্মার শয়তানি ওয়াসওয়াসার তৃপ্তি সাধন করে। কিন্তু সত্যের জন্য যে ব্যক্তি সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে সে যে সাফল্য ও পরিতৃপ্তির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায় তার কল্পনা করার ক্ষমতা কোনো রুগ্ন আত্মার নেই। তাই জালেমের মানসিক পীড়া বাড়তে থাকে এবং অন্যদিকে হকের জন্য জীবন উৎসর্গকারী অলক্ষ্যে তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকে। এটাই জালেমের পরাজয়।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যের সোচ্চার কণ্ঠ

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) ছিলেন তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। ৩৭ হিজরীতে কুফায় তাঁর জন্ম এবং ইন্তেকাল ৯৪ হিজরীতে। সাহাবাদের একটি নির্বাচিত দলের থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লা ইবনে যুবায়েরের (রাঃ) ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ।

তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ফকীহ। ইলমের বিভিন্ন শাখার বড় বড় ইমামরা তাঁর কাছে আসতেন ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন ঃ হাজ্জাজ সাঈদ ইবনে জুবায়েরকে হত্যা করেছে, অথচ সারা পৃথিবীতে এমন এক ব্যক্তি নেই যে তাঁর ইলমের মুখাপেক্ষী নয়। সত্য প্রকাশের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্ভীক। তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে কুণ্ঠিত হতেন না, এটিই ছিল তাঁর দোষ। এ জন্য রক্তপিপাসু গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁর রক্তের পিয়াসী হয়ে পড়েন।

কুফার গভর্ণর হাউসে বসে আছেন বনী উমাইয়ার রক্ত পিপাসু গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। হাজ্জাজ ছিলেন শাহী তখতের চিরায়ত গোলাম। শাসক যা করবেন সবই ঠিক। এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না। শাসকের জুলুম, জুলুম নয়, বরং প্রজার প্রাপ্য, এর বিরুদ্ধে কিছু বলা দন্ডনীয় অপরাধ। এ ছিল হাজ্জাজের মতবাদ ও বিশ্বাস। অন্যদিকে সাঈদ ইবনে জুবায়ের ছিলেন জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ।

হাজ্জাজ দরোজার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তিনি কারোর আগমন প্রতীক্ষা করছেন। এমন সময় এক কয়েদীর উদয় হলো। হাতে-পায়ে শিকল জড়ানো। গায়ের রং কালো। মাথা ও দাড়ির চুল সাদা। হাজ্জাজের দু'চোখ থেকে আগুন ঝরছে। ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার নাম কি?"

"সাঈদ ইবনে জুবায়ের।"

"না, সাঈদ নয়, শাকী," (অর্থাৎ সৌভাগ্যবান নয়, দুর্ভাগা।)

"আমার মা আমার নামের ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভালো জানতেন।"

"তোমার মা ছিল দুর্ভাগা আর তুমিও দুর্ভাগা।

"গায়েবের খবর রাখেন অন্য কোনো সত্তা, তুমি নও।

"আমি তোমার দুনিয়াকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেবো।"

"আমি যদি একথা বিশ্বাস করতাম, তাহলে তোমাকে আল্লাহ বলে মেনে নিতাম"

"মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে তুমি কি বলো?"

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি ছিলেন আদমের সন্তানদের নেতা। মুস্তফা, নির্বাচিত মনোনীত নবী। মানব জাতির সুবাসিত পুষ্প।"

"আবুবকর সম্পর্কে কি বলো?"

"তিনি সিদ্দীক ছিলেন। তিনি সততার মধ্যে জীবনযাপন করেন এবং যখন মারা যান নিজের পেছনে রেখে যান সুনাম ও সুখ্যাতি। জীবন ভর চলতে থাকেন তাঁর নবীর পথে এবং তাঁর পথ থেকে এক চুলও সরে আসেননি।"

"উমরের ব্যাপারে কি চিন্তা করো?

"উমর ছিলেন ফারুক। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। আল্লাহর মকবুল বান্দা এবং তাঁর রাসূলের প্রিয় সাথী। নিজের দুই বন্ধুর পথেই তিনি চলেছেন এবং তা থেকে একটুও বিচ্যুত হওয়া পছন্দ করেননি।"

"উসমান সম্পর্কে কি বলো?"

"মজলুম ও শাহাদত প্রাপ্ত। প্রাচুর্যের মধ্যেও কৃচ্ছ্রসাধনকারী। রুমার কুয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন, জান্নাতে নিজের গৃহ ক্রয়কারী আল্লাহর রাসূলের জামাতা ও বন্ধু।

"আলীকে কেমন মনে করো?"

"আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই। কিশোরদের মধ্যে প্রথম মুসলিম। ফাতেমাতুয যাহরার স্বামী এবং হাসান ও হোসাইনের সম্মানিত পিতা।"

"আব্দুল মালেকের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?"

"এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো যার বহু গুণাহের মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে তোমার অস্তিত্ব?"

"আমার ব্যাপারে কি বলো?"

"তোমার ব্যাপারে তুমি নিজেই ভালো জানো।"

"তবুও আমি তোমার মুখ থেকে জানতে চাই?"

"তুমি অসন্তুষ্ট হবে এবং রেগে যাবে।"

"তবুও বলো।"

"এ ব্যাপারে আমাকে মাফ করো।"

"যদি আমি তোমাকে মাফ করি, তাহলেও আল্লাহ্ আমাকে মাফ করবেন না।"

"আমি তো এতটুকু জানি যে, আল্লাহর কিতাবের নাফরমানি করা তোমার জীবনের মূল নীতিতে পরিণত হয়েছে। নিজের প্রবৃত্তির ইংগিতে তুমি এমন সব কাজ করো যার মাধ্যমে তোমার ভীতি মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মতো বসে যায়। কিন্তু এ বিষয়টি তোমাকে ধ্বংস করে দেবে।"

"হে সাঈদ! তোমার জন্য আফসোস।"

"আফসোস তার জন্য যাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হয়েছে।"

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, সাঈদের সামনে মণি-মুক্তা-ইয়াকুতের স্তূপ সাজাও।"

হুকুম তামিল করা হলো। সাঈদ বললেন ঃ

"যদি তুমি এই উদ্দেশ্যে মণি-মুক্তার স্তূপ করে থাকো যে, এর বিনিময়ে তুমি কিয়ামতের দিনের ভীতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবে তাহলে ভিন্ন কথা, অন্যথায় সেটা এমন ভয়াবহ দিন হবে যে দিন মা তার দুধের সন্তানের কথা ভুলে যাবে। দুনিয়ার স্বার্থ কামাবার উদ্দেশ্যে যাকে জমা করা হয়েছে তার মধ্যে নেকী নেই, তবে যদি তা হালাল ও পবিত্র হয়।"

"তুমি হাসোনা কেন?"

"সে ব্যক্তি কেমন করে হাসতে পারে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে এবং মাটিকে আগুন পোড়ায়?"

এরপর হাজ্জাজ বলতে শুরু করেনঃ

"আমি তোমাকে এমনভাবে হত্যা করবো যেভাবে আজ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করিনি এবং আগামীতেও করবো না।"

"তুমি আমার দুনিয়া বরবাদ করবে, আমি তোমার আখেরাত বরবাদ করে দেবো।"

"হে সাঈদ! নিজের জন্য যে ধরনের মৃত্যু পছন্দ করতে চাও করো।"

"হাজ্জাজ! আখেরাতে নিজের জন্য যে ধরনের হত্যা পছন্দ হয় তাই এখানে অবলম্বন করো।"

"তুমি কি চাও আমি তোমাকে মাফ করে দিই?"

"যদি মাফ করে দাও তাহলে মাফ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, এতে তোমার কোনো অবদান থাকবে না। তুমি এ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হবে না এবং তোমার কোনা ওজর কবুলও করা হবে না।"

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, নিয়ে যাও এবং হত্যা করো।

সাঈদ দরোজা দিয়ে বের হতে গিয়ে হেসে ফেললেন। হাজ্জাজের কাছে খবর পৌঁছে গেলো। তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হাসলে কেন?

"আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার দুঃসাহস এবং তোমার মোকাবিলায় আল্লাহর হুকুম দেখে আমি অবাক হয়েছি।"

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, "যে চামড়ার ওপর হত্যা করা হবে সেটি বিছিয়ে দাও।" চামড়া বিছানো হলো। হুকুম হলো, "এবার হত্যা করো।"

সাঈদ কিবলার দিকে মুখ করে পড়লেন ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাঁউ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন- "আমি একান্তভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে

ফিরালাম যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।"

হাজ্জাজ চিৎকার করে ওঠলেন, "ওর মুখ কিবলার দিক থেকে ফিরিয়ে দাও।"

"সাঈদ বললেন, আইনামা তুওয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ্ "যেদিকে মুখ ফেরাও সেদিকেই আছেন আল্লাহর সত্তা।"

হাজ্জাজ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার দিলেন; "তাকে জমিনের ওপর উপুড় করে দাও।"

সাঈদ বললেন ঃ "মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফীহা নুয়ীদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।" এই জমি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, এর মধ্যেই তোমাদের ফিরিয়ে নেবো, আবার এর ভেতর থেকে তোমাদের পুনরায় বের করে আনবো।

হাজ্জাজ হুংকার দিলেন ঃ ওকে শিগগির জবাই করো।

সাঈদ কালেমা শাহাদত পড়তে থাকলেন এবং বলতে থাকলেন ঃ "হাজ্জাজ এবার রোজ কিয়ামতে তোমার সাথে দেখা হবে। হে আল্লাহ আমার পরে আর কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার ক্ষমতা যেন তার না থাকে।" এরপর জল্লাদের তরবারি তাঁকে দ্বিখন্ডিত করলো।

ইমাম আওযায়ী শাসকের রক্তচক্ষুর পরোয়া করেন নি

ইসলামী আদর্শ প্রথম যুগে এমন সব আদর্শ ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে যারা ইসলামের সঠিক আদর্শ, চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালী অনুযায়ী মুসলমানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা নিখুঁতভাবে সত্যের অনুসরণ করেছেন, নির্ভীক চিত্তে তাকে পেশ করেছেন এবং এ ব্যাপারে পরিবেশ পরিস্থিতির বিরূপতার পরোয়া করেননি। হিজরী প্রথম শতকের এমনই এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন সিরিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবু আমর আওযায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্। হিজরী ৭৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্তেকাল করেন ১৫৭ সালে।

তাঁর সমকালীন হাদীস ও ফিকহের ইমামগণ তাঁকে এতো উচ্চ আসনে বসিয়েছেন যে, তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে হেঁটে চলাকে তাঁরা নিজেদের জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয় মনে করতেন। প্রখ্যাত হাদীস বেত্তা ইবনে মেহদী বলেন, চার ব্যক্তি হাদীসের ইমাম হিসেবে গণ্য। তারা হচ্ছেন মালেক, আওযায়ী, সওরী ও হাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ। একদিন সুফিয়ান সওরী ও আওযায়ী ইমাম মালেকের খিদমতে হাজির হলেন। তারা বিদায় নেবার পর ইমাম মালেক বললেন, এদের দু'জনের মধ্যে একজন ইলমী দিক দিয়ে তার সাথীদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখেন না। অন্যদিকে দ্বিতীয়জন হচ্ছেন নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন। অর্থাৎ তিনি ইমাম আওযায়ীর প্রতি ইঙ্গিত করেন।

আওযায়ী ছিলেন গণচেতনার অধিকারী গণ-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অন্যদিকে সওরী বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আবু ইসহাক ফাযারী বলেন, আমাকে যদি সওরী ও আওযায়ীর মধ্য থেকে একজনকে নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করতে বলা হয়, তাহলে আমি আওযায়ীকে নির্বাচিত করবো। কারণ তার মধ্যে ব্যাপকতা ও সহজতা আছে। একবার হজ্জের সফরে ইমাম সুফিয়ান সওরীর সাথে তার দেখা হলো। সওরী তার উটের লাগাম হাতে ধরে সামনে হেঁটে চললেন এবং বলতে থাকলেন ঃ শাইখের জন্য পথ ছেড়ে দাও। ইবনে উয়াইমা বলেন ঃ আওযায়ী হচ্ছেন তার যুগের ইমাম।

সিরিয়ার জনগণ তার ফিকহী মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। তিনি উমাইয়া বাদশাহদের গুণগ্রাহী না হলেও আব্বাসীয়দের জুলুম নিপীড়নের চরম বিরোধী ছিলেন। এ সত্ত্বেও আব্বাসী বাদশাহ আবু জাফর মনসুর তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। কিন্তু হক কথা বলার ব্যাপারে তিনি কখনও মনসুরের রক্তচক্ষুর পরোয়া করেননি। ইতিপূর্বে প্রথম আব্বাসী বাদশাহ সাফফাহর চাচা এবং সিরিয়ার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনে আলীর সাথে তাঁর বিরোধ বাধে। আবদুল্লাহ ছিলেন বড়ই কড়া মেজাজ, রাগী ও জালেম প্রকৃতির লোক। আবার সময়টাও ছিলো এমন যখন আব্বাসীরা উমাইয়াদের লাশের স্তূপের উপর তাদের ক্ষমতার আসন পেতেছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে আলী বনী উমাইয়াদের বন্ধু ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকদের খুঁজে ফিরছিলেন। তার তালিকায় ইমাম

আওযায়ীর নাম ছিলো সবার উপরে। ইমাম সাহেব আত্মগোপন করে ফিরছিলেন। কিন্তু কতদিন আত্মগোপন করে ফিরবেন। একদিন নিজেই দরবারে হাজির হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আলী সিংহাসনে বসেছিলেন। তার হাতে ছিলো বর্শা। খুনী জল্লাদরা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়েছিলো। আওযায়ী সিংহাসনের নিকটবর্তী হয়ে সালাম করলেন। আবদুল্লাহ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আওযায়ীর উপর। সালামের জবাব দেবার পরিবর্তে নিজের বর্শা মেঝেতে গেঁথে দিয়ে বললেন ঃ "আওযায়ী! আমরা দেশ ও জাতিকে ঐ জালেমদের (অর্থাৎ বনী উমাইয়া) হাত থেকে বাঁচাবার জন্য লড়েছি। তোমার মতে, এটা জিহাদ ছিলো কি না?"

ইমামের জন্য এটা ছিলো বড়ই কঠিন সময়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব দিলেন। তিনি বললেন ঃ "আমি ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, সমস্ত কাজ নির্ভর করে নিয়তের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভালো ও মন্দ নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে।"

আপাতদৃষ্টিতে জবাব ছিলো পক্ষপাতহীন এবং এর মধ্যে কারোর জন্য কোনো ক্ষতি ছিলো না কিন্তু মূলত এটি ছিলো বড়ই কঠোর। ইমামের উদ্দেশ্য ছিলো, যদি রাষ্ট্র ও ক্ষমতা দখল তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তার ফল পাবে। আর যদি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই জিহাদের সওয়াব পাবে।

আবদুল্লাহর চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করলো। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি বর্শা মেঝেতে গেঁড়ে দিলেন এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, "হে আওযায়ী! বনী উমাইয়ার হত্যা জায়েয ছিলো অথবা নাজায়েয?"

ইমাম আওযায়ী জবাবে আবার রাসূলের (সাঃ) একটি হাদীস শুনালেন, "হে আমীর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের রক্তপাত কেবল তিনটি অবস্থায় বৈধ। **একঃ** সে কাউকে হত্যা করেছে এবং তার কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে। **দুইঃ** বিবাহিত হয়েও যিনা করেছে এবং তার শাস্তিস্বরূপ তাকে রজম করা হবে। **তিনঃ**

ইসলাম গ্রহণ করার পর সে মুরতাদ হয়ে গেছে। এই অপরাধে তাকে হত্যা করা হবে।"

এ জবাব শুনে আবদুল্লাহ্ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং তার চোখ দিয়ে যেনো আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছিলো। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, "বনী উমাইয়ার ধন-সম্পদ সম্পর্কে তুমি কি বলো?"

"যদি এ ধন-সম্পদ তারা হারাম পথে অর্জন করে থাকেন, তাহলে আপনাদের হাতে এসে তা হালাল হয়ে যাবে না। আর যদি তা হালাল থেকে থাকে, তাহলে আপনারা তা কেবল শরীয়ত নির্ধারিত পথেই গ্রহণ করতে পারেন।" ইমাম আওযায়ী জবাব দিলেন।

আবদুল্লাহর অবস্থা দেখার মতো ছিলো। তিনি ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত দরবারে নেমে এসেছিলো মৃত্যুর ভয়াবহ নীরবতা। জল্লাদরা তাদের তলোয়ার বাগিয়ে ধরেছিলো। শুধুমাত্র হুকুমের অপেক্ষা। ইমাম আওযায়ী তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় কোনো রকম চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও ভীতির ছাপ দেখা গেলো না। চারদিকের পরিবেশের প্রভাব মুক্ত হয়ে তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখতে দেখতে আবদুল্লাহর অবস্থা বদলে গেলো। ক্রোধের চিহ্ন তার চেহারা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছিলো। কেবল দরবারীরাই নয়, ইমাম আওযায়ীও তার চেহারা পালটে যাওয়া দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

"আপনাকে যদি কাযীর পদ দেয়া হয় তাহলে কি গ্রহণ করবেন?" আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন। এবার তার স্বর ছিলো কোমল এবং তাতে ইমামের প্রতি মর্যাদার আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো।

ইমাম ওজর পেশ করলেন এবং বিদায় নেবার জন্য অনুমতি চাইলেন। আবদুল্লাহ অনুমতি দিলেন। ইমাম দরবার থেকে বের হয়ে মাত্র কিছুদূর গিয়েছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহর দূত তাঁর কাছে পৌঁছে গেলো। তিনি ভাবলেন, রাজা-বাদশাহদের কান্ড, হয়তো হত্যার পরোয়ানা এসে গেছে। তখনই সওয়ারী থেকে নেমে জীবনের শেষ নামায ইসলামের শহীদ হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু যে সুন্নাত জারী করে গিয়েছিলেন, পড়তে শুরু করে দিলেন। দূত তার নামায শেষ হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

ইমাম আওযায়ী নামায শেষ করলে সে একটি থলি পেশ করলো এবং বললো, আমীর এ দু'শ দীনার আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। ইমাম থলি গ্রহণ করলেন। কিন্তু গৃহে পৌঁছার আগেই সমস্ত অর্থ আল্লাহর পথে দান করে দিলেন।

হারুনর রশীদের প্রতি ফুযাইল ইবনে ইয়ায

বাদশাহ হারুনর রশীদ হজ্জ করার জন্য মক্কা মুয়াযযমায় এসেছেন। তাঁর সাথে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী ফযল ইবনে রবী। বাদশাহকে নিয়ে ঘুরছেন তিনি গভীর রাতে বাদশাহর মনের খটকা দূর করার জন্য। কিন্তু কোথাও সান্ত্বনা বা মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারছেন না।

ফযল পরামর্শ দিলেন পবিত্র হরমের মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কাছে যাবার। দুজনে মিলে চললেন সুফিয়ানের তাঁবুর দিকে। ফযল বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন বাইরে অপেক্ষা করছেন।

সুফিয়ান দ্রুত বাইরে বের হয়ে এলেন। বললেন, "আমীরুল মুমিনীন। আমাকে তলব করলে আমি চলে যেতাম, আপনার আসার প্রয়োজন হতো না।"

"প্রয়োজনটা আমার। তাই আমি চলে এসেছি।" হারুন জবাব দিলেন।

কিছুক্ষণ তাঁরা কথাবার্তা বললেন। তারপর হারুন চলে যাবার জন্য উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ওপর কোনো ঋণের বোঝা আছে?

"জি, হ্যাঁ সুফিয়ান বললেন।"

বাদশাহ প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আবুল আব্বাস! ওনার ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেবেন।"

সেখানে থেকে তাঁরা বের হয়ে এলেন, পথে বাদশাহ বললেন, "ফযল, মনের খটকা দূর হচ্ছে না। বড়ই অশান্তি অনুভব করছি। আর কোথাও কি যাওয়া যায়?"

"আমীরুল মুমিনীন! এদিকে ইমাম আব্দুর রাযযাক ইবনে হুমাস ইবনে নাফে আল-হামীরী আসসমআয়ী থাকেন। তিনি একজন আলেমে রব্বানী। চলেন তাঁর কাছে যাই।" ফযল পরামর্শ দিলেন।

দুজনে ইমাম আব্দুর রাযযাকের তাঁবুতে হাযির হলেন। আওয়াজ পেয়ে তিনি তাঁবুর বাইরে এসে বাদশাহকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, "মহামান্য বাদশাহ! এতো রাতে আপনার আসার দরকার ছিল না। আমাকে ডাকলেই চলে যেতাম।"

বাদশাহ বললেন, "আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছি তার জন্য কিছু করুন।"

এরপর কিছুক্ষণ আলোচনার পর বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কোনো ঋণ আছে?"

আব্দুর রাযযাক ইতিবাচক জবাব দেবার পর বাদশাহ তাঁর ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে হুকুম দিলেন।

বাইরে এসে বাদশাহ বললেন, "তোমাদের এই আলেমে রব্বানীও আমাকে পরিতৃপ্ত করতে পারলেন না। অন্য কারোর সন্ধান করা দরকার।"

"এদিকে থাকেন ফুযাইল ইবনে ইয়ায। রুশদ ও হেদায়াতের সবচেয়ে বড় ইমাম। তাঁর কাছে আমরা যেতে পারি।" ফযল বললেন। উভয়েই পৌঁছলেন ফুযাইলের তাঁবুতে। ফুযাইল তখন তাঁর রবের দরবারে হাজিরা দিচ্ছিলেন। রাত গভীর হতে চলেছিল। ফুযাইলও ছিলেন গভীরভাবে নামাযে মশগুল। তিনি কুরআনের একটি আয়াত বারবার পড়ছিলেন। নামায শেষ হলে ফযল দরোজায় করাঘাত করলেন। ফুযাইল জিজ্ঞেস করলেন, "কে"?

"আমীরুল মুমিনীন তাশরীফ এনেছেন।" ফযল বললেন।

"আমীরুল মুমিনীনের সাথে আমার কি কাজ?" ফুযাইল ভেতর থেকে জবাব দিলেন।

"সুবহানাল্লাহ। আমীরুল মুমিনীনের আনুগত্য কি ওয়াজিব নয়?" ফযল প্রশ্ন করলেন।

ফুযাইল দরোজা খুলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে জ্বলতে থাকা একমাত্র চেরাগটি নিবিয়ে দিলেন। এই সাথে নিজেও ঘরের এক কোণে গিয়ে সেটিয়ে থাকলেন। ঘন অন্ধকারে ঘর ছেয়ে গেলো। বাদশাহ হারুনর রশীদ ও ফযল উভয়ে দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চললেন। শেষে হারুনর রশীদ ফুযাইলকে ধরে ফেললেন। হারুন ফুযাইলের হাত ধরলেন। ফুযাইল বলে উঠলেনঃ

"আহা, কী নরোম হাত। আবার এর সৌভাগ্যেরও শেষ নেই, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাবের হাত থেকে যদি রক্ষা পেতে পারে।"

"আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে এসেছি।" হারুন বললেন।

"কি উদ্দেশ্যে? কেমন উদ্দেশ্য? আপনি তো নিজের ওপর ভরসা করে বসে আছেন। আপনার সাথিরাও আপনাকে তাদের ভরসার কেন্দ্রে পরিণত করেছে। অথচ তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, রোজ কিয়ামতে আপনি তাদেরকে আপনার গুনাহের ভার বহন করতে বলবেন কিন্তু তারা অস্বীকার করে বসবে। আজ তারা আপনার প্রতি যত বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করছে কাল ঠিক ততটাই দূরে সরে যাবে।" ফুযাইল এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন। তারপর আবার বললেনঃ

"আমীরুল মুমিনীন। উমর ইবনে আব্দুল আযিয যখন খিলাফতের দায়িত্ব হাতে নিলেন তখন সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব, মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কারযী ও রজা ইবনে হায়াতকে ডাকলেন। তাদেরকে বললেন, দেখুন, আমাকে এই পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে। আপনারা কিছু পরামর্শ দিন।"

"আমীরুল মুমিনীন।" ফুযাইল বললেন, "তিনি খিলাফতকে নিজের জন্য পরীক্ষা মনে করেছিলেন। কিন্তু আপনি ও আপনার সাথিরা একে আল্লাহর অপরিসীম নিয়ামত মনে করে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাই সালেম বললেন, যদি আপনি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চান, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধ, প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে নিজের পিতার সমপর্যায়ের, প্রৌঢ় ও মাঝারি বয়সের লোকদেরকে নিজের ভাই এবং ছোট ও কম বয়সীদেরকে নিজের সন্তান মনে করুন। নিজের পিতার

সমপর্যায়ের লোকদের সাথে সদাচার করুন। নিজের ভাইদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল হোন।"

ওজা ইবনে হায়াত বললেন, "যদি আপনি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চান তাহলে মুসলমানদের জন্য পছন্দ করুন যা নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং নিজের জন্য যে জিনিসটি খারাপ মনে করেন তা মুসলমানদের জন্য খারাপ মনে করুন। তারপর যখন মৃত্যু আসে তাকে হাসিমুখে বরণ করে নেবেন।"

"হে আমীরুল মুমিনীন।" ফুযাইল বললেন, "আমিও আপনাকে সেই একই পরামর্শ দিচ্ছি। আমি আপনাকে সেই দিনের ভয় দেখাচ্ছি যেদিন বড় বড় শক্তিশালী ব্যক্তির পা কেঁপে উঠবে। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনার সাথীরা কি উমর ইবনে আব্দুল আযীযের সাথীদের মতই? আপনাকে কি তারা তাঁদের মতই পরামর্শ দেন?"

হারুনর রশীদ কেঁদে ফেললেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়লেন। ফযল ফুযাইল ইবনে ইয়াযকে বললেন "হে শাইখ! আমীরুল মুমিনীনের সাথে কোমল ব্যবহার করুন।"

"হে রবীর বেটা! তুমি ও তোমার সাথীরা আমীরুল মুমিনীনকে হত্যা করেছো। আর এখন আমাকে কোমল ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছো?" ফুযাইল অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন।

হারুনের জ্ঞান ফিরে এলে ফুযাইলকে বললেন, "হে শাইখ! আরো কিছু বলুন।"

ফুযাইল বললেন, "আমীরুল মুমিনীন! উমর ইবনে আব্দুল আযীযের এক গভর্ণর তাঁর কাছে নালিশ জানালেন এই মর্মে যে, কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি, ফলে তিনি শুতে ও ঘুমাতে পারেন না। উমর তাকে জবাবে লিখে জানালেন, "হে আমার ভাই। দোজখীরা দোজখে সর্বক্ষণ জাগ্রত থাকবে। তারা শুতে, ঘুমাতে পারবে না। তুমি সেই সময়ের কথা ভাবো। একদিন ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় নিজের রবের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সে পথে তোমার পা যেন না কাঁপে। সত্যের প্রতি অবজ্ঞাকারী লোকদের মধ্যে যেন তুমি গণ্য না হও এবং আশার শেষ সেতু বন্ধনটি ছিন্ন না হয়ে যায়।"

সেই গভর্ণর এ পত্রটি পাওয়ার পর শত শত মাইলের পথ অতিক্রম করে উমরের খিদমতে হাযির হয়ে গেলেন, উমর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি, কি জন্য এলেন?" গভর্ণর জবাব দিলেন, "আপনার পত্র আমার মনের পরদা ছিঁড়ে দিয়েছে। এখন আর আমি জীবিত অবস্থায় কোনো এলাকার প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতে রাজি নই।"

হারুন উচ্চ স্বরে কাঁদতে থাকলেন এবং বলতে থাকলেন, "আরো কিছু বলুন।"

ফুযাইল বললেন, "আমীরুল মুমিনীন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস একবার তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল। আমাকে কোনো এলাকার খিদমতের দায়িত্ব দিন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

"হে আব্বাস! যে নফসকে তুমি জীবিত ও নিরাপদ রাখতে পারো, তা এমন হুকুমাত থেকে ভালো যার দায়িত্ব অগণিত। হুকুমাত কিয়ামতের দিন আক্ষেপ ও লজ্জার কারণ হবে। কাজেই শাসন ক্ষমতা লাভের আকাংখা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করে রাখতে পারলে ভালো।"

হারুন আবার উচ্চ স্বরে কাঁদতে থাকলেন এবং বলতে থাকলেন, "আল্লাহর রহমতের ছায়া আপনার ওপর দীর্ঘতর হোক। আরো কিছু বলুন।"

ফুযাইল বললেন, "ওহে সুন্দর চেহারা ও সুঠাম দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী,' কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাকে এই সৃষ্টিটি সম্পর্কেও প্রশ্ন করবেন। এই চেহারাকে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। দৈনন্দিন জীবন এমনভাবে যাপন করুন যাতে আপনার প্রজারা আপনার প্রতি ঘৃণা পোষণ না করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার প্রভাত এমন অবস্থায় হয় যে, প্রজাদের দিল তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর থাকে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না।"

হারুন আবার কাঁদতে থাকলেন এবং বললেন, "আপনার কোনো ঋণ আছে কি?"

ফুযাইল বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই আমার রবের ঋণ আছে। তিনি এর হিসাব নেবেন। কাজেই ধ্বংস আমার জন্য যখন আমার হিসাব নেয়া

হবে। ধ্বংস আমার জন্য যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। আর ধ্বংস আমার জন্য যখন আমার কোনো যুক্তি কাজে লাগবে না।"

হারুন বললেন "আমি বলতে চাচ্ছি মানুষের ঋণের কথা।"

ফুযাইল বললেন, "আমার রব আমাকে-এর হুকুম দেননি। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন, তাঁর ওয়াদাকে যেন আমি সত্য বলে মেনে নেই এবং তাঁরই আনুগত্য করি। আল্লাহ বলেছেন, "আমি জ্বিন ও মানুষকে ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। আমি তাদের থেকে রিযিক হাসিল করতে চাইনা এবং তারা আমাকে খাওয়াবে এটাও চাই না। অবশ্যই আল্লাহই রিযিকদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।"

(আয্‌যারিয়াত ঃ ৫৭)

হারুন বললেন, "এই এক হাজার দীনার নিন। নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য খরচ করুন এবং এর সাহায্যে নিজের রবের ইবাদতে শক্তি অর্জন করুন।

ফুযাইল বললেন, "সুবহানাল্লাহ! আমি আপনাকে দেখালাম সত্য ও সততার পথ আর আপনি আমাকে তার প্রতিদান দিতে চান।"

ফুযাইল চুপ হয়ে গেলেন। হারুন ও ফযল আর কিছু বলার সাহস করলেন না। তাঁরা সালাম দিয়ে উঠে পড়লেন। বাইরে এসে হারুন বললেন, "এমন লোককেই আমি খুঁজে ফিরছিলাম।"

ইহসানের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায

পৃথিবীতে মানবিক জীবন-যাপনের জন্য আল্লাহর দেয়া কতিপয় হুকুম-আহকামের নাম ইসলাম বা ইসলামী শরীয়ত। এই সংগে আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কও আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অনেক ধর্মে দেখা যায় কেবল আল্লাহর সাথে মানুষের এই সম্পর্কের তথা ইবাদত-বন্দেগীর ভিত্তিতেই সমগ্র ধর্ম ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। আবার অনেক ধর্মে ইবাদত ও বন্দেগীর সাথে সাথে আংশিক শরীয়ত ব্যবস্থাও স্থান লাভ করেছে। কিন্তু ইসলামে শরীয়ত ব্যবস্থা যেমন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে ঠিক তেমনি ইবাদত-বন্দেগীও পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। এদুটি

ব্যবস্থারই মূল উৎস আল্লাহর অহী এবং সে অহীকে বাস্তবায়নকারী তাঁর নবীর প্রক্রিয়া তথা সুন্নাত।

ইসলামে আল্লাহর অহী ও নবীর সুন্নাতের বাইরে তৃতীয় কোনো মূল উৎস বা সূত্র নেই। অন্য সবকিছু সূত্র বা উৎস এই দুই মূল উৎস থেকেই উৎসারিত। কাজেই শরীয়ত হোক বা ইবাদত-বন্দেগী হোক, কোনোটিই আল্লাহর অহীর বিপরীতমুখী হতে পারে না। তাছাড়া শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যই কিন্তু আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় করা। এজন্যই বিভিন্ন হুকুম-আহকাম প্রদান করা হয়েছে এবং তা থেকে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন দুনিয়াতে এবং মানুষের ওপর আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যেও রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার স্বীকৃতি। তাই শরীয়ত ও ইবাদত একই ব্যবস্থার দুটি অংশমাত্র। বরং বলা যায় একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা।

শরীয়তের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ইবাদতেরও মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। শরীয়ত যেমন আল্লাহ ও রাসূল নির্ধারিত, ইবাদত ও তেমনি আল্লাহ ও রাসূল নির্ধারিত। তবে শরীয়ত যেহেতু বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তনশীল ঘটনা ও বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তাই সেখানে পরিবর্তনের মোকাবিলা করে ইসলামী জীবন ধারাকে আল্লাহ ও রাসূল নির্ধারিত পথে পরিচালনার জন্য ইজতিহাদ ও রায় গঠন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইবাদত এ ধরনের কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ যে ধরনের ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাসূল যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে সে ইবাদত করেছেন সে ধরনের ইবাদত ঠিক সেভাবে ও সে পদ্ধতিতেই করতে হবে। সেটিই হবে ইসলামী ইবাদত। এছাড়া অন্য কোনো ইবাদত বা অন্য কোনোভাবে ও অন্য কোনো পদ্ধতিতে ইবাদত করলে তা ইসলামী ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না।

যেমন কুরআনে সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সালাত মানে দোয়া। কোনো ব্যক্তি যদি বসে-বসে বা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেবল দোয়াই করতে থাকেন। নামাযের ওঠা-নামা-সিজদা কোনোটাই করলেন না এবং সুরা-কিরাত এবং অন্য দোয়া-দরুদ-তাসবীহ কিছুই পড়লেন না। অথবা

নামাযের মতো ওঠা-নামা-সিজদা সবই করলেন কিন্তু নির্ধারিত সূরা-তাসবিহ দোয়া কোনোটাই পড়লেন না। সব ক্ষেত্রেই নিজের মনের মতো দোয়া করতে থাকলেন, তাহলে তা নামায বা সালাত রূপে গণ্য হবে না। ফলে তাঁর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরয আরোপিত হয়েছে, তা যেমন আদায় হবে না তেমনি এগুলোর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নৈকট্যলাভও করতে পারবেন না।

এরপরও পার্থিব ও বৈষয়িক মোহমুক্ত হয়ে অত্যধিক পরিমাণ আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর অধিক নৈকট্যলাভের প্রবণতা একদল আল্লাহপ্রেমী মানুষের মধ্যে সকল যুগেই জাগরুক থেকেছে। তাঁদেরকেও আল্লাহর রাসূলের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে। কারণ আল্লাহর রাসূল সবচেয়ে বেশী আল্লাহ প্রেমী এবং আল্লাহর সবচেয়ে নিকটের। তাঁর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক আল্লাহর সবচেয়ে নিকটের ফেরেশতা জিবরীলের মাধ্যমে এবং সরাসরিও। তিনি মি'রাজের মাধ্যমে আল্লাহর সমীপে নিকটতর হবার জন্য বেশি বেশি ইবাদত করেছেন। এর সীমারেখাও আল্লাহ নির্ধারিণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, "সারারাত ইবাদত নয়। রাতের কিছু অংশ বাদ দাও। অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কম অথবা তারচেয়ে বেশি। আর কুরআন পড়ো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। (আল-মুয্যাম্মিল ঃ ২-৪)

অন্যদিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করা সম্পর্কে তাঁর সাহাবাদেরকে যে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, তার নির্গলিতার্থ হচ্ছেঃ আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর সাথে আমার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এসব সত্ত্বেও আমি দিনরাত নামায পড়ি না। অর্থাৎ নামায পড়ি আবার বিশ্রাম নিই এবং অন্যান্য কাজ করি। আমি লাগাতার দিনরাত বা দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস রোযা রাখি না। কখনো রোযা রাখি আবার কখনো রাখি না। আমি ঘরসংসার করি। অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তানদের এবং পাড়াপ্রতিবেশীর হক আদায় করি। এরপর তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বলেন, যে আমার এ নিয়ম মেনে চলেনা সে আমার দলভুক্ত নয়। অর্থাৎ সে মুসলিম ও মুমিন নয়।

এভাবে আল্লাহপ্রেমীদের আল্লাহর অধিকতর নৈকট্য লাভের জন্য যে ব্যবস্থা আল্লাহর রাসূল গড়ে তুলেছেন ইসলামের পরিভাষায় তাকে ইহ্সান বলা হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকের তাবা-তাবেয়ী হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রঃ) ছিলেন এই ইহ্সানের একজন আদর্শ অনুসারী। পরবর্তীকালে এই ইহ্সানের মধ্যে অন্যান্য মুশরিকী ধর্মের কৃচ্ছ্রতা, যোগসাধনা ও রাহ্বানীয়াতের যে অনুপ্রবেশ ঘটে তা থেকে তাঁর ইবাদত ও জীবন ধারা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাঁর প্রথম জীবন ছিল অত্যন্ত কলুষিত। ডাকাতি ও রাহাজানী ছিল তাঁর পেশা। হজ্জের কাফেলা যেপথ দিয়ে চলতো সেপথে তিনি ওৎ পেতে বসে থাকতেন এবং তাদের সর্বস্ব লুট করে নিতেন। কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা তাঁর নেকী ও সৎবৃত্তির চেতনায় কশাঘাত করলো। তাঁর ভেতরের সৎ ও দায়িত্বশীল পুরুষটি জেগে উঠলো। তিনি তওবা করলেন। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এ সময় তিনি নিজের পুরাতন ঘাঁটিতে ফিরে আসছিলেন। পথে দেখলেন একটি কাফেলা তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। কিছু লোক বলাবলি করছে, এখান থেকে এবার রওয়ানা হওয়া দরকার। আবার কিছু লোক বলছিল, এখানেই আজ রাতটা কাটিয়ে দেয়া ভালো। সামনে দস্যু ফুযাইলের ঘাঁটি। দেখার সাথে সাথেই সে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সবকিছু লুটেপুটে নেবে। তাদের কথাবার্তা ফুযাইলের বিবেক ও অন্তরাত্মাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। ভাবতে লাগলেনঃ হায়! আমার রাতগুলো কাটে গুনাহর মধ্যে। মুসলমানরা আমার ভয়ে ভীত এবং আমার এবং আমার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। আমার কারণে তারা নিরাপদে সফর করতে পারে না এবং দুদন্ড নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবারও সুযোগ পায় না। এই পাপের জীবন থেকে আমাকে সরে আসতেই হবে। যেই কথা সেই কাজ। সংগে সংগেই বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমি সাচ্চা দিলে তওবা করছি। গুনাহের জীবন ত্যাগ করে তোমার গৃহের প্রতিবেশী হবার সংকল্প করছি।"

এভাবে ফুযাইলের জীবন পাল্টে গেলো। তিনি আর আগের ফুযাইল থাকলেন না। পাষান দিল গলে মোম হয়ে গেলো। ভোগ ও গাফলতির পরিবর্তে আল্লাহ প্রেম ও আল্লাহভীতি তাঁর ও হৃদয়ে স্থান লাভ করলো।

এখন তাঁর রাত কাটে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে। সারা দিন ইলম হাসিল করার কাজে ব্যয় করতেন। কুরআন ও হাদীসের বড় বড় ইমামগণ ছিলেন তাঁর উস্তাদ। সুফিয়ান সওরী, আমাশ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, হামীদ আত্‌তাবীনের মতো জ্ঞানী আলেম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ ছিলেন তাঁর উস্তাদ। তাঁদের সাহচর্যে এসে তিনিও জ্ঞানের শীর্ষদেশে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফলে অনেক সমকালীন আলেম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তাঁর উস্তাদ সুফিয়ান সওরী তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর চারিত্রিক উন্নতি ও কার্যধারার পবিত্রতা সরবে ঘোষণা দিয়েছেন যুগের ইল্‌ম ও আমলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। শারীক বলেনঃ প্রত্যেক জাতির জন্য প্রতি যুগে কোনো এক ব্যক্তি হন দলীল, প্রমাণ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। ফুযাইল হচ্ছেন তাঁর যুগের লোকদের জন্য দলীল এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেনঃ সারা পৃথিবীতে ফুযাইলের চেয়ে শ্রেষ্ঠজন আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

ফুযাইল তাঁর তওবা অনুযায়ী বাইতুল হারামের পাশে তাঁর আবাস তৈরি করেন। ইসলামী বিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে মুসলমানরা তাঁর কাছে আসতো এবং জীবনের উত্তাপ ও অফুরান সম্পদ লাভ করতো। তিনি পবিত্র জীবন যাপন করতেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলতেন। নিশি জাগরণ করে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতেন। হালাল রুজির প্রতি ফুযাইল অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। বশির ইবনুল হারেছ বলেনঃ ফুযাইল এমন দশ ব্যক্তির অন্যতম যাদের পেটে হালাল খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু প্রবেশ করতো না।

আল্লাহর যিকির ছিল ফুযাইলের দৃষ্টিতে জীবনের আসল তাৎপর্য "আলা বিযিক্‌রিল্লাহি তাত্‌মাইন্‌নুল কুলূব-জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির হৃদয়ে প্রশান্তি আনে।" (আর রাআদ ঃ ১৩) জীবনের যে মুহূর্তটি আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হতো সে মুহূর্তটির জন্য তাঁর আফসোসের অন্ত থাকতো না। তাঁর মতে এই আল্লাহর যিকিরবিহীন মুহূর্তগুলো মানুষকে রিয়াকারিতা ও বানোয়াট জীবন যাপনে লিপ্ত করে। সে আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রবণতা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। একবার সুফিয়ান সওরী ও ফুযাইল সারারাত একত্রে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে

কাটিয়ে দেন। সকালে সুফিয়ান বলেন, আজ রাতটি খুব ভালই কাটলো। জীবনে এমন রাত কমই আসে। ফুযাইল বলেনঃ "আজ রাতটি ছিল বড়ই খারাপ রাত। কারণ আজ যদি আমরা দু'জন আলাদা রাত কাটাতাম, তাহলে দুজনের প্রত্যেকের নিশি জাগরণ হতো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্যলাভের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতাম। কিন্তু এর মোকাবিলায় আজ রাতভর আপনার মনে এ চিন্তা এসেছে যে, এমন কোনো কাজ যেন না করি বা কথা না বলি যাতে আমি মনে কষ্ট পাই আবার অন্যদিকে আমার মনে এ চিন্তা জেগেছে যে, আমি যেন এমন কোনো কিছু না করি বা বলি যাতে আপনি মনে কষ্ট পান। এভাবে আমি আপনার সন্তুষ্টি ও আপনি আমার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রেখেছেন।"

ফুযাইল সরকারী প্রশাসন থেকে দূরে অবস্থান করতেন। কিন্তু সুযোগ পেলে তার সংশোধনের জন্য নিজের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালাতেন। শাসকের রক্তচক্ষুর তিনি পরোয়া করতেন না। সত্য কথা যতই তিক্ত হোকনা কেন তাদের সামনে নিসংশয়ে বলে যেতেন।

ফুযাইল ইবনে ইয়াজের (রঃ) জন্ম ১০৬ হিজরীতে এবং তিনি ইন্তিকাল করেন হিজরী ১৮৭ সনে।

খোলা তলোয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সত্যের বাণী উচ্চারণ করলেন

খিলাফতের অবসানের পরে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম যুগে যে রাজতন্ত্রের প্রচলন হয় তা ছিল খোলা তলোয়ারের মতো। অর্থাৎ এইসব রাজা-বাদশাহ-শাসকদের বিপক্ষে বা এদের কথার ওপর কথা বলা ছিল খোলা তলোয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলা। যে কোনো মুহূর্তে মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতো। তাদের কথাই ছিল আইন এবং চূড়ান্ত নির্দেশ। তার ওপর আর কোনো হুকুম ছিল না।

এমন এক চরম স্বৈরাচারী শাসনের আওতায় মুসলিম আলেম সমাজ হক ও সত্যের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে কোনো প্রকার শৈথিল্য দেখাননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী লিপিবদ্ধ হওয়ার

কাজ তখন চলছে। একদল দরবারি স্বার্থান্বেষী আলেমের তখনো পসার ছিল, এতে সন্দেহ নেই। তারা বাহবা কুড়াবার এবং সরকারের নেক নজর ও শাহী এনাম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো বানোয়াট হাদীসের মহড়া দিতো। এমনি এক হাদীসের মুখোমুখি হলেন হিজরী প্রথম শতকের তাবেয়ী ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী।

উমাইয়া বাদশাহ ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের দরবারে যাতায়াত ছিল ইমাম যুহরীর। ওলীদ তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। দ্বীনী বিষয়াবলীতে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। একদিন ইমাম যুহরী দরবারে প্রবেশ করার পর বাদশাহ তাঁকে বললেনঃ হে শায়খ! আপনি কি এ হাদীসটি শুনেছেন যেটি সিরিয়াবাসীরা বর্ণনা করে থাকে?

কোন হাদীসটি? হে আমীরুল মুমিনীন! ইমাম যুহরী জিজ্ঞেস করলেন।

তারা বলে থাকে ঃ "মহান আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে শাসন ক্ষমতা দান করেন তখন তার আমল নামায় কেবল নেকীই লিখে থাকেন, গুনাহ লেখা হয় না।"

ইমাম যুহরীর চেহারার রং বদলে গেলো। সেখানে ক্রোধের ভাব ফুটে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। মনে হয়ে নিজের আবেগ দমন করার চেষ্টা করছেন। তারপর বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন! যারাই একথা বলে থাকুক না কেন তারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন ধরনের কোনো কথা শোনা যায়নি। ইমামের আওয়াজে ছিল আলেম সুলভ গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি আবার বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন! আপনিই বলুন, আল্লাহর কাছে কোন্ বাদশাহ বেশি সম্মানীয় - যিনি নবী অথবা যিনি নবী নন?

যে বাদশাহ নবী তিনি অবশ্যই বেশি সম্মানীয় হবেন।

তাহলে শুনুন আল্লাহ সূরা সোয়াদ-এ কী বলেছেন তাঁর নবী দাউদ আলাইহিস্‌ সালাম সম্পর্কে, যিনি বাদশাহও ছিলেনঃ "হে দাউদ! আমি তোমাকে জমিনে খলীফা বানিয়েছি এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি হক ও ইনসাফের সাহায্যে লোকদেরকে শাসন করবে। এ ব্যাপারে নিজের

খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ ত্যাগ করে বিপথে পরিচালিত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবস থেকে বিস্মৃত হয়েছে।" (২৬ আয়াত)

আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর এ ক্রোধ এমন বাদশাহর জন্য যিনি নবী ছিলেন, তাহলে যিনি নবী নন তার ব্যাপারে তাঁর ক্রোধ কি পরিমাণ হতে পারে একবার ভেবে দেখুন।

ইমাম যুহরী খামুশ হয়ে গেলেন। ওলীদ তাঁর কথা শুনছিলেন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। তিনি বললেনঃ এই তোষামোদকারীরা আমাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

একবার এর চেয়েও মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের শাসনকাল চলছিল। একদিন বাদশাহ ইমাম যুহরীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কুরআনে আয়েশার (রাঃ) প্রতি অপবাদ রচনার বিরুদ্ধে যে আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি"- এ বাক্যাংশে উল্লেখিত ব্যক্তি কে?

ইমাম যুহরী বললেন ঃ এ ব্যক্তি হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

হিশাম রাগত স্বরে বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। এই অপবাদ রচনায় জবাব চেয়ে জোরেশোরে অংশগ্রহণ করে আলী।

ইমাম যুহ্রীর চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেলো। তিনি প্রচন্ড ক্রোধে বাদশাহকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

"তোর বাপ মরুক। আমি মিথ্যা কথা বলছি? আল্লাহর কসম! যদি আকাশ থেকেও কেউ চিৎকার করে বলে, আল্লাহ মিথ্যা বলা হালাল করে দিয়েছেন, তাহলেও আমি মিথ্যা বলবো না।"

তাঁর বাদশাহকে সম্বোধন করার ভংগীমায় সমগ্র দরবার কক্ষে পিনপতন নীরবতা নেমে আসলো। সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ী করতে লাগলো। কি জানি কখন কী হয়ে বসে! হিশামের চেহারার বরাবর রং বদলানো দেখার মতো ছিল। কিন্তু ইমাম যুহরীর কণ্ঠ উচ্চতর হয়ে চলছিলঃ

“সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, উবাইদুল্লাহ্, আলকামাহ্ সবাই আমাকে বলেছেন, হযরত আয়েশা নিজেই কুরআন মজীদের এ আয়াতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে নির্দেশিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

এ কথা বলে ইমাম যুহ্‌রী উঠে দাঁড়ালেন এবং ক্রুদ্ধ ভংগীতে দরবার থেকে বের হয়ে গেলেন। দরবারে দীর্ঘক্ষণ নীরবতা বিরাজ করতে থাকলো। সত্যের উলংগ প্রকাশ তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকলো। বাদশাহ্ হিশামের আবেগ-অনুভূতি ধীরে ধীরে শীতল হয়ে গেলো। তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললেনঃ আমরা শাইখকে নারাজ করে দিলাম।

অসত্যের বিরুদ্ধে যে ইমাম যুহ্‌রীকে আমরা দেখলাম ক্রোধে দুর্বিনীত তিনি কিন্তু স্বভাবতই অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র এবং উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সদাচারের আদর্শ হিসেবে পরিচিত। তিনি যেমন ইলম ও জ্ঞানের সমুদ্র তেমনি মুত্তাকী ও ইবাদতগুজার। স্মরণশক্তি এত প্রবল ছিল যে, মাত্র ৮০ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন হিফ্‌য সম্পন্ন করে ফেলেন।

ইমাম যুহ্‌রী ছিলেন এতিম। কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং নিজের পরিশ্রম ও সাধনার বলে ইল্‌মী দুনিয়ায় উন্নত মার্যাদার প্রতিষ্ঠিত হতে তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। কুরাইশ বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর সময়ের মদীনা এমন একটি শহর ছিল যার অলিতে গলিতে ইল্‌মের স্রোত বয়ে যেতো। প্রতিটি গৃহই ছিল জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। কেবল পুরুষরাই নয়, মেয়েরাও জ্ঞান চর্চায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। যুহ্‌রী বিভিন্ন গৃহের পুরুষ-নারী-শিশু নির্বিশেষে সবার কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করেন। তাঁর শিক্ষকদের নামের তালিকায় রয়েছেন পনের জন শ্রেষ্ঠ সাহাবা, মদীনার সাতজন খ্যাতিমান ফকীহ্ এবং প্রবীণ তাবেয়ীদের একটি বিরাট দল। কেবল মদীনা নয়, মদীনার বাইরে বের হয়ে ইলমের অন্যান্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর এই বিপুল পরিশ্রমের ফলে শীঘ্রই তিনি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমের মর্যাদা লাভ করেন। ইসলামী বিশ্বে এ সময় মাকহূলের ইলমীয়াত ছিল সর্বজন স্বীকৃত। তিনি তদানীন্তন বড় বড় আলেম, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসদের থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার চেয়ে বড় কোনো আলেমের সাথে কি

আপনার সাক্ষাত হয়েছে? জবাবে তিনি ইমাম যুহ্রীর নাম নিলেন। তাঁর ছাত্রদের প্রতি তাকালে বুঝা যাবে তিনি কত বড় আলেম ছিলেন। নিচে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলোঃ আতা ইবনে আবী রিবাহ, উমর ইবনে আবদুল আযীয, আমর ইবনে দীনার, সালেহ্ ইবনে কাইসান, আইয়ূব সাখতিয়ামী, ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা, লাইছ ইবনে সা'দ।

জ্ঞানের সাথে সাথে চারিত্রিক দৃঢ়তায়ও তাঁর জুড়ি ছিল না। অন্যায় ও অসত্যের সামনে কখনো মাথা ঝুঁকাতেন না। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন দৃষ্টান্ত। মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ ছিলেন। সবসময় সামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় থাকতেন। অর্থাৎ জিহাদে শামিল হবার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন। অত্যন্ত দানশীল ছিলেন।

তিনি বনী উমাইয়ার ছয়জন বাদশাহর শাসনকাল দেখেছিলেন। তাদের সবার সাথে তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময় দামেশকে দারিদ্রের মধ্যেই তিনি লালিত পালিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ধনের সাগরে বসবাস করতেন। কিন্তু ধনাঢ্যতাকে কোনো গুরুত্ব দিতেন না। আমর ইবনে দীনার বলেনঃ দিরহাম ও দীনার যুহ্রীর দৃষ্টিতে উটের লেদীর চাইতে বেশি গুরুত্বের অধিকারী ছিল না।

এ ছিল ইসলামের প্রথম যুগের একজন সত্যপন্থী আলেমের চেহারা। বস্তুত ইসলামের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে এ ধরনের অসংখ্য আলেমের পরিচিতি।

সুফিয়ান সওরী ঃ এক নির্ভীক কণ্ঠ

রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচার অতি দ্রুত একজন শাসককে জালেমে পরিণত করে। শাসকের মর্জির বিরুদ্ধে যে কোনো কাজই দন্ডনীয় অপরাধ। এমনকি তার সামান্য নারাজি প্রাণদন্ডের কারণ।

মুসলমানদের মধ্যে যখনই রাজতন্ত্রের প্রচলন হয়েছে তখন থেকেই জুলুমতন্ত্র সমানতালে এগিয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম এমন একটা নিযামের প্রচলন করেছে যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ

এবং কিয়ামতে আল্লাহর সামনে সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে হবে, এই ভাবধারা সবসময় জাগরুক থেকেছে। এর ফলে শাসকের নিজের এ ব্যাপারে যতটুকু সজাগ দৃষ্টি থাক বা না থাক, শাসিতদের মধ্য থেকে সব সময় একদল লোক এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এসেছে। মুসলমানদের মধ্যে যতোদিন পর্যন্ত এ ধরনের লোকেরা অভাব হয়নি, ততোদিন পর্যন্ত জালেম শাসক তার জুলুমের পাগলা ঘোড়ার মুখে লাগাম দিতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামী বিশ্বে রাজতান্ত্রিক শাসনের গোড়ার দিকে জুলুমতন্ত্র যেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিলো, তেমনি জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী মর্দে মুজাহিদের সংখ্যাও কম ছিলো না।

আব্বাসী শাসনের গোড়ার দিকে জালেম শাহীর বিরুদ্ধে এমনি একজন নির্ভীক প্রতিবাদকারী ছিলেন সুফিয়ান সওরী। ৯৬ হিজরীতে তার জন্ম এবং মৃত্যু ১৬১ হিজরীতে। তিনি ছিলেন একজন তাবাতাবেয়ী এবং তার যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুজতাহিদ। তার সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেন ঃ ইতিপূর্বে ইরাকে টাকা পয়সা ও কাপড়ের প্রাচুর্য ছিলো কিন্তু সুফিয়ান সওরী যখন সেখানে গেছেন, তখন থেকে সেখানে ইল্‌ম ও জ্ঞান চর্চার প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে। তার ইলমিয়াত এতো উচ্চ পর্যায়ের ছিলো যে, তার সমকালীন সকল আলেম ছিলেন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

উমাইয়া রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবু জাফর মনসুর তখন বাগদাদের সিংহাসনে আসীন। এ সময়কার ঘটনা। ইমাম সুফিয়ান সওরীর ইলমী মজলিস সরগরম ছিলো। সুফিয়ানের চতুরদিকে বসেছিলেন তার গুণগ্রাহী ছাত্রবৃন্দ, যুগের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। এমন সময় সেখানে হাজির হলো বাদশাহ মনসুরের বার্তাবাহক। সালাম ও দোয়া খায়েরের পরে সে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে নিজের আস্তিনের মধ্য থেকে সীলমোহর মারা একটি পত্র ইমামের সামনে পেশ করলো। সে বলতে থাকে, এটা আমীরুল মুমিনীনের পত্র। সুফিয়ান পত্র হাতে নিয়েছিলেন কিন্তু আমীরুল মুমিনীর নাম শুনতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! এমন জিনিসে আমি হাত লাগাবো না যাকে জালেমের হাত স্পর্শ করেছে। তারপর নিজের এক শাগরিদকে চিঠিটি পড়ার হুকুম দিলেন। শাগরিদ সীলমোহর ভেঙ্গে চিঠিটি খুলে পড়তে লাগলোঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা আমীরুল

মুমিনীন আবু জাফর মনসুরের পক্ষ থেকে দ্বীনী ভাই সুফিয়ান সা'দ আস্ সওরীকে।

"আমার ভাই! আপনি জানেন, আল্লাহ মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এই ভ্রাতৃত্বের পথ ধরেই আপনাকে আমি ভালোবাসি। খিলাফতের জিঞ্জিরে আটকা না থাকলে আমি নিজেই আপনার খিদমতে হাজির হয়ে যেতাম। আল্লাহ আমাকে সুমহান মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। এমন কেউ নেই যে আমাকে এ জন্য মুবারকবাদ দেয়নি। আমার অর্থ ভান্ডারের মুখ খুলে দিয়ে বসে আছি। যে আসছে এখান থেকে নিয়ে খুশী হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এই দান, বখশিস, বদান্যতা ও মহানুভবতা আমার চোখের জ্যোতি ও হৃদয়ে অনাবিল শান্তির পসরা বয়ে আনছে। কিন্তু আপনি এখনো কষ্ট করে একবার আসলেন না। এই পত্রখানি আপনার বহু আকাঙ্খিত আসার আর্জি হিসেবে পেশ করলাম। হে আবু উবাইদ! আপনি জানেন মুমিনের যিয়ারত এবং তার সাথে মোলাকাতের ফজিলত। কাজেই পত্র পেয়েই তাশরীফ আনার চেষ্টা করবেন।"

ইমাম সুফিয়ান পত্রপাঠ শুনছিলেন এবং তার চেহারায় বিরক্তি ও ক্রোধের আভা ফুটে বের হচ্ছিলো। পত্র পাঠ শেষ হলে ইমাম বললেন ঃ এই পত্রের অপর পিঠেই জালেমের জবাব লিখে দাও। উপস্থিত গুণগ্রাহীরা বললেনঃ হে আবু উবাইদ! আমীরুল মুমিনীনের ব্যাপার। জবাব আলাদা কাগজে লিখে দিলে ভালো হয়। বললেনঃ এই পত্রের পিঠেই লেখো। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে যদি এই পত্রের কাগজ সংগৃহীত না হয়ে থাকে তাহলে মনসুরকে এর সাথেই জাহান্নামের আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হবে। আমার এখানে আমি এমন কোনো জিনিস রাখা পছন্দ করবো না যাকে জালেমের হাত স্পর্শ করেছে। এমন জিনিস আমার দ্বীনও বরবাদ করে দিতে পারে।

বাদশাহর পত্রের জবাবে লেখা হলোঃ "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা সুফিয়ানের পক্ষ থেকে আবু জাফর মনসুরকে, যে আশা ও আকাঙ্খার প্রতারণার জালে আবদ্ধ, ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ যার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং যে কুরআন তেলাওয়াতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দ্যাখো আমি তোমাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি,

আমার ও তোমার মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা খতম হয়ে গেছে। তুমি তোমার পত্রে নিজেই স্বীকার করেছো যে, তুমি মুসলমানদের বাইতুলমাল অযথা তসরুফ করছো। তোমার পত্র যাদের সামনে পঠিত হয়েছে তাদের সবাইকে তোমার অপরাধের সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো এবং কাল যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে, তখন আমরা সবাই এর সাক্ষ্য দেবো।"

"হে মনসুর! তুমি মুসলমানদের সম্পদ বরবাদ করছো। আল্লাহর পথের মুজাহিদরা, গরীব, দরিদ্র, এতিম, শিশু ও বিধবা নারীরা এবং তোমার বাকি প্রজাকুল কি তোমার এ কার্যকলাপ সমর্থন করে?"

"হে মনসুর! নিজের হাত টেনে নাও। কাল তোমাকে আল্লাহর দরবারে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে। ভালভাবে জেনে রাখো, আল্লাহর সত্তা বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তাঁকে ভয় করো। তোমার ঈমান ও তাকওয়া কেড়ে নেয়া হয়েছে। তোমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে কুরআন তেলাওয়াতের স্বাদ ও ন্যায়-নিষ্ঠদের মজলিসে বসা থেকে। তুমি জালেমদের শীর্ষনেতা হওয়া পছন্দ করেছো।"

"হে মনসুর! তুমি রাজ সিংহাসনে বসে আছো। রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করছো। তোমার দরজায় পরদা লটকে রেখেছো। জালেম সিপাহী তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন চালায়। কিন্তু সেই মজলুমদের ফরিয়াদ শোনার জন্য কেউ আসে না। তোমার লোকেরা অন্যকে শরাব পানের জন্য দন্ড দেয় অথচ নিজেরা শরাব পান করে। ব্যাভিচারীকে শাস্তি দেয় কিন্তু নিজেরা ব্যাভিচার করে। চোরদের হাত কাটে, আর নিজেরা চুরি করে। হত্যাকারীকে প্রাণদন্ড দেয় অথচ নিজেরা হত্যা ও খুনখারাবির ব্যাপারে খুনিদের চেয়েও নির্ভীক ও বেপরোয়া। আল্লাহর মাখলুক তাদের জুলুমে অতিষ্ঠ কিন্তু তার কোনো চিন্তাই তোমাদের নেই। বরং যারা নিজেদেরকে এসব অন্যায় থেকে সরিয়ে রেখেছে তাদেরকেও তুমি এই পাপে জড়িয়ে ফেলতে চাও। তোমার দান ও বদান্যতার কোনো প্রয়োজন আমার নেই এবং তোমার সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতেও আমি চাই না।"

সুফিয়ানের জবাব মনসুরকে ক্রুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার হাত-পা ছিলো বাঁধা। বনি উমাইয়াকে হটিয়ে বনী আব্বাস সবেমাত্র

ক্ষমতার আসনে বসেছিল। এখনো আসন পাকাপোক্ত হয়নি। সাধারণ মুসলমানদের পুরোপুরি সমর্থন এখনো তারা লাভ করতে পারেনি। উলামা, ফকিহ, মুহাদ্দিস ও সমাজে পরিচিত সৎ ব্যক্তিদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের এখনো তাদের অনেক প্রয়োজন ছিল। সাধারণ মুসলমানদের ওপর এদেরই প্রভাব বেশি। এদের সমর্থন লাভ করার পরই তারা নিজেদের সমস্ত কাজের বৈধতার ছাড়পত্র লাভ করতে পারবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সুফিয়ানকে এ পত্র লেখা হয়েছিল। কিন্তু সুফিয়ান সওরী তাদের হাতে ধরা দেননি। তাদের জুলুমকে বৈধতা দান করার জন্য তার সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে ব্যবহার করা যেতে পারে আশংকায় তিনি তাদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতে চাননি।

একবার হজ্জের মওসুমে মসজিদে হারামে সুফিয়ানের সাথে মনসুরের দেখা হয়ে গেলো। মনসুর তার কাঁধে হাত দিয়ে কাবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন। এই গৃহের রবের কসম! আমাকে আপনি কেমন মানুষ পেয়েছেন? সুফিয়ান নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন ঃ এই গৃহের রবের কসম! আমি তোমাকে নিকৃষ্টতম মানুষ হিসেবে পেয়েছি।

একবার মনসুর তাকে হত্যা করার সংকল্প করলেন। হজ্জে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হুকুম দিলেন, হারাম শরীফের বাইরে শূলদন্ড প্রোথিত করো। তিনি জানতে পারলেন, সুফিয়ান সওরী মসজিদে হারামে আছেন। ফুযাইল ইবনে ইয়াযের কোলে মাথা এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কোলে দুই পা রেখে তিনি শায়িত ছিলেন। মনসুরের হুকুম এবং তার আসার খবর শুনে ফুযাইল ও ইবনে উয়াইনা ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু সুফিয়ান বললেন, কাবার রবের কসম! এ গৃহে প্রবেশ করার সৌভাগ্য মনসুরের নেই। তারপর উঠে বসলেন এবং কাবার গেলাফ ধরে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মনসুরের হাত থেকে নাজাত দাও। নিজের রবের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং তার প্রতি একান্ত নির্ভরতায় পরিপূর্ণ এ দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেলো। মনসুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তার লাশ মক্কায় পৌঁছালো।

মাক্‌হুল ইল্‌মের মর্যাদা বুলন্দ করেন

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে বিশ্বে যখন ইসলামের প্রসার ঘটছিল তখন দাস প্রথার প্রচলন ছিল ব্যাপকভাবে। ইসলাম এ প্রথা নির্মূল না করলেও সংযত করে এবং নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখে। ইসলামের বিভিন্ন বিধানের মাধ্যমে দাসত্বের বলয় সংকুচিত হতে থেকেছে।

তাছাড়া ইসলাম দাসদের সাথে মানবিক ব্যবহারের বিধান দিয়েছে। সামাজিক অধিকার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে একটা ইনসাফভিত্তিক পরিবেশ তৈরি করেছে। ফলে আমরা দেখি ইসলামের প্রথম যুগ থেকে নিয়ে পরবর্তীকালে কোনো সময়েই সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে দাসদের মর্যাদাপূর্ণ অংশগ্রহণ কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়নি। আজকের বিশ্বে সভ্যতাগর্বী উন্নত জাতিরা অনুন্নত জাতিদের জন্য স্বাধীনতার যে তথাকথিত ধারণা তৈরি করেছে ইসলামী শাসনামলে দাসদের সাথে ইসলামের ব্যবহার তার চাইতেও অনেক বেশি স্বাধীনতার প্রেরণা সমৃদ্ধ ছিল। হিজরী প্রথম শতকের মুহাদ্দিস ও ফকীহ আবু আবদুল্লাহ মাকহুল দামিশকী (মৃঃ ১১৮ হিঃ)-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাঁর পিতার নাম ছিল সোহরাব। কাবুলের অধিবাসী। যুদ্ধবন্দী হিসাবে দামেশকে আসেন। দাস পরিবারে জন্ম হলেও ইসলামী সামাজিকতা ও সহমর্মিতার কারণে শৈশব থেকে মাকহূলের উন্নত মানের শিক্ষাদীক্ষায় কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। সাহাবা ও প্রবীণ তাবেয়ীদের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। শীঘ্রই ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে তাঁর নাম। জ্ঞান পিপাসুরা দূর দূরান্ত থেকে আসতে থাকেন এবং মাকহূলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতে থাকেন।

সে যুগে ইসলামী বিশ্বের চারজন শ্রেষ্ঠ আলেমের মধ্যে মাকহুলকে গণ্য করা হতো। অন্য তিনজন হচ্ছেন মদীনার আলেম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব। কুফার আলেম আমের আশ্‌শা'বী। বসরার আলেম হাসান ইবনে আবুল হাসান। অন্যদিকে মাকহূল ছিলেন দামেশ্‌কের আলেম।

মাকহূলের শাগরিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ইবনে শিহাব যুহরী। সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকীহ্গণ যুহরীর জ্ঞান, পান্ডিত্য ও সূক্ষ্ম ইল্ম চর্চার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মাকহূলের আর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাগরিদ ছিলেন ইমাম আওযায়ী। ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্যেও বাস্তববাদী রায়ের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল মুসলমানদের একটি বিরাট গোষ্ঠীর ওপর এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা তাঁর রায় মেনে চলেছিল।

মাকহূলের অন্যতম সাগরিদ ছিলেন মদীনার আলেম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। তাঁর সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনে উয়াইন বলেছিলেন ঃ মুহাম্মদ যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন মদীনায় ইল্মের ধারাও অব্যাহত থাকবে।

মুহম্মদ ইবনে আজলামও ছিলেন তাঁর শাগরিদদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক বলেছিলেন ঃ "মুহাম্মদ ইবনে আজলান হচ্ছেন আহ্লি ইলমদের মধ্যে ইয়াকুত তথা পদ্মরাগ মনি সদৃশ।"

তাঁর অন্যান্য শাগরিদরাও ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম। যেমন হামীদুত তাবীল, মূসা ইবনে ইয়াসার, সাঈদ ইবনে আবদুল আযী, আইয়ুব ইবনে মূসা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, উসামা ইবনে যায়েদিশী, ছাবেত ইবনে ছাওবান, হাজ্জাজ ইবনে ইরতাত, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ, ইকরামা ইবনে আম্মার প্রমুখ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসবৃন্দ।

এভাবে এক দাস পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পরও কেবল ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে মাকহুলের পক্ষে ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়নি। এতবড় আলেম হওয়ার পরও তাঁর মধ্যে সামান্যতম অহমিকাবোধও ছিল না। কেউ তাঁর কাছে কোনো বিষয়ে ফতোয়া জানতে চাইলে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতেন ঃ ভাই, আমার জানা নেই। এমন কারোর কাছ থেকে জেনে নাও যে জানে।" কখনো ফতোয়া দিলেও বলে দিতেনঃ দেখো ভাই, এটা আমার রায়, ঠিক হতে পারে, ভুলও হতে পারে।

ইল্মের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তিনি সর্বক্ষণ সচেতন থাকতেন। একবার শাহী পরিবারের প্রভাবশালী সদস্য ইয়াযীদ ইবনে আবদুল

মালেককে দেখা গেলো পরিষদবর্গের বিশাল বাহিনী নিয়ে তাঁর দিকে আসছেন। ইয়াযীদও শাহী সিংহাসনের একজন উমেদার ছিলেন। নিকট ভবিষ্যতে তাঁর রাজ সিংহাসনে বসার সম্ভাবনাও একেবারে ক্ষীণ ছিল না। কাজেই আহলি মজলিস তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে জায়গা দেবার জন্য একটু সরে বসতে চাইলো। এ দৃশ্য দেখে মাকহুল বললেন ঃ তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে কেউ একটুও সরবে না। তারা যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসবে। ইল্‌মের মজলিসে তাদের অবশ্যই বিনয়ী হতে হবে।

এভাবে মাকহুল ইল্‌মের মর্যাদা বুলন্দ করেছিলেন।

আবু হাযেম বাদশাহ্‌কে উপদেশ দিলেন

উমাইয়া বাদশাহ সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেক বাইতুল্লায় হজ্জ সেরে মদীনায় এলেন। মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য তিনি রাসূলের (সঃ) কোনো সাহাবীর সোহবত লাভকারী বুযর্গ ব্যক্তিত্বের সন্ধান করলেন।

শহরের গভর্ণর হযরত আবু হাযেমের নাম বললেন। সুলাইমান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি এলেন না। বলে পাঠালেন, বাদশাহের সাথে আমার কোনো কাজ নেই। আর আমার কাছেও বাদশাহকে দেবার মতো কিছু নেই।

কাজেই সুলাইমান নিজেই তাঁর কাছে এলেন। মশহুর মুহাদ্দিস ইমাম যুহ্‌রীও তাঁর সাথে ছিলেন।

সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে শাইখ আমরা মৃত্যুকে ভয় করি কেন?

আবু হাযেম ঃ তোমরা তোমাদের দুনিয়া আবাদ করে নিয়েছো এবং আখেরাত বরবাদ করে দিয়েছো। এখন আবাদ করা এলাকা থেকে বরবাদ করা জনবসতিহীন এলাকায় যেতে ভয় তো লাগবেই।

সুলাইমান ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন শাইখ আবু হাযেম! এখন বলুন, কিয়মতের দিন আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কি আছে?

আবু হাযেম ঃ নিজের কৃতকর্মকে আল্লাহর কিতাবের মানদন্ডে রেখে বিচার করো।

সুলাইমান ঃ আল্লাহর কিতাব থেকে পথ নির্দেশনা কিভাবে পাবো?

আবু হাযেম ঃ আল্লাহর এই বাণী থেকে - ইন্নাল আবরারা লাফী নায়ীম, ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফী জাহিম, ইয়াসলাউনাহা ইয়াউমাদ্দীন, ওয়ামাহুম আন্‌হা বিগায়েবীন। অর্থাৎ নেককাররা জান্নাতে অবস্থান করবে এবং বদকাররা জাহান্নামে থাকবে। কর্মফল দিবসে তারা তাতে প্রবেশ করবে। তারা সেখান থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না।

সুলাইমান ঃ আল্লাহর রহমত কোথায় পাওয়া যাবে?

আবু হাযেম ঃ নেককার ও ইহ্‌সান-এর মর্যাদায় উন্নীত লোকদের সান্নিধ্যে।

সুলাইমানের চেহারার রং পালটে যাচ্ছিল। বাদশাহী গাম্ভীর্যের পরিবর্তে নম্রতা ও বিনয়ের রেশ ফুটে উঠছিল তার সমগ্র অবয়ব থেকে। চোখে দেখা দিয়েছিল অশ্রু। চিৎকার করে উঠলেন, হায় আফসোস! তারপর আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললেনঃ আল্লাহর সামনে কিয়ামতের দিন আমাদের কিভাবে হাযির করা হবে?

আবু হাযেম ঃ নেককার ও সৎকর্মশীল লোকেরা এমনভাবে হাযির হবে যেমন কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন পরে তার স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে আসে আনন্দচিত্তে। অন্যদিকে বদকার লোকদেরকে পলাতক গোলামের মতো লজ্জিত কুণ্ঠিত পদক্ষেপে আসামীর মতো আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে।

সুলাইমান নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকেন। তার মনের ক্লেদ ধুয়ে মুছে যায়। তারপর জিজ্ঞেস করেনঃ হে আবু হাযেম! আমরা নেককারী ও সততা কিভাবে অর্জন করতে পারবো?

আবু হাযেম ঃ জুলুম ত্যাগ করো এবং আদল, ইনসাফ ও বিনয়ের পথ অবলম্বন করো।

সুলাইমান ঃ এটা কিভাবে করবো?

আবু হাযেম ঃ হকের পথ অবলম্বন করে কোনো কিছু গ্রহণ করবে এবং হকের পথ অবলম্বন করে কাউকে কিছু দেবে।

সুলাইমান ঃ সর্বোত্তম হক কি?

আবু হাযেম ঃ এমন কোনো ব্যক্তির সামনে সত্য কথা প্রকাশ করা যাকে লোকেরা আশা ও ভীতির চোখে দেখে।

সুলাইমান ঃ সর্বোত্তম সাদ্‌কা কি?

আবু হাযেম ঃ মানুষ কোনো দুখী ও অভাবীজনকে যে সামান্যতম জিনিস দেয় কিন্তু এজন্য তার প্রতি কোনো করুণা প্রদর্শনও করে না এবং তাকে দুঃখও দেয় না।

সুলাইমান ঃ সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে?

আবু হাযেম ঃ যে আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষমতা রাখে। নিজে আনুগত্যের হক আদায় করে এবং অন্যদেরকেও সেপথে চালায়।

সুলাইমান ঃ সবচেয়ে বোকা কে?

আবু হাযেম ঃ যে কোনো জালেমের সহযোগী হয় এবং তার দুনিয়াকে সুসজ্জিত করে দেয়ার বিনিময়ে নিজের আখেরাত বরবাদ করে।

সুলাইমান ঃ আমাদের হুকুমাত সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

আবু হাযেম ঃ আমি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করছি।

সুলাইমান ঃ না, কিছুতো বলুন। আপনার উপদেশ আমার বড়ই প্রয়োজন।

আবু হাযেম ঃ লোকেরা মুসলমানদের পরামর্শ ও উম্মতে মুসলিমার সম্মতি ছাড়াই ক্ষমতার মসনদে বসে গেছে। কাজেই দুনিয়াবী স্বার্থে তারা মানুষের রক্ত প্রবাহিত করছে এবং নিজেদের কামনা চরিতার্থ করছে।

সুলাইমান ঃ আপনি কি আমাদের সাহচর্য পছন্দ করবেন? আমরা আপনার থেকে লাভবান হবো এবং আপনি হবেন আমাদের থেকে।

আবু হাযেম ঃ কখনোই না।

সুলাইমান ঃ কেন?

আবু হাযেম ঃ আল্লাহর সাহচর্য ছেড়ে আপনাদের সাহচর্য লাভ করলে ভয় করি আল্লাহ আমাকে ডবল আযাব দেবেন এবং তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

সুলাইমান ঃ কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন।

আবু হাযেম ঃ আমার প্রয়োজন ও অভাব আমি আল্লাহর হাওয়ালা করে দিয়েছি। তিনি অভাবীদের অভাব আপনার চাইতে অনেক বেশি পূরণ করেন। তিনি আমাকে যা কিছু দেন তাই আমার জন্য যথেষ্ট। আর যা তিনি আমাকে দেন না তাতে আমি রাজি থাকি। আমার রব বলেন, নাহ্নু কাসামনা মায়ীশাতাহুম - আমিই তাদের রুজি বন্টন করে দিয়েছি। কাজেই আমার অংশের রুজিতে কমবেশি করতে পারে কে?

আবু হাযেম একজন তাবেয়ী ছিলেন। তাঁর ইন্তেকাল হয় ১৪০ হিজরীতে। তিনি এক দাস পরিবারের সন্তান। নিজের প্রচেষ্টায় এবং ইসলামী সমাজের সমমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের গুণে তিনি জ্ঞান চর্চার উচ্চ শিখরে পৌঁছে যান। শ্রেষ্ঠ সাহাবী ও প্রবীণ তাবেয়ীদের থেকে ইল্‌মে হাদীস ও ফিক্‌হের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন সাহ্‌ল ইবনে সা'দ, আনাস ইবনে মালেক ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ও আতা ইবনে আবি রিবাহের ন্যায় মহান তাবেয়ীবৃন্দ। ইমাম যুহ্‌রী, ইমাম মালেক, ইবনে আজলান, হাম্মাদ, সুফিয়ান সওরী, ইবনে আবী যাহাব ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ তাঁর শাগরিদ দলের অন্তরভুক্ত।

ইমাম লাইছের ইল্‌ম চর্চা

ইমাম লাইছ ইবনে সা'দ ছিলেন মিসরের ইমাম ও মুহাদ্দিস। হিজরী দ্বিতীয় শতকের কথা। সমগ্র ইসলামী বিশ্বে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি পরিচিত। সে আমলে যেসব মুহাদ্দিস ও ফকীহ শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন, তিনি তাদের দলভুক্ত ছিলেন না। শাসকদের সাথে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। তাদেরকে নসিহত করতেন। শাসকরা তার কথা মানতেন। নিজের এই প্রভাবকে তিনি সমসময় সত্য ও ন্যায়ের

সপক্ষে একটি ইতিবাচক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতেন। বাদশাহ ও গবর্নরগণ যখনই তার কাছে কোনো পরামর্শ চাইতেন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার জবাব দিতেন। একবার হারুনর রশীদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মিসরের সমৃদ্ধি ও উন্নতি কিসের ওপর নির্ভর করে? তিনি পরিষ্কার জবাব দিলেন, নীলনদের প্রবাহ অব্যাহত থাকা এবং মিসরের শাসকদের সততা ও তাকওয়ার ওপর।

শাসকদের প্রশংসা তিনি করতেন না। বরং কেউ প্রশংসা করলে তাকে থামিয়ে দিতেন। সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি আম্মার ইবনে মানসুর একবার মিসরের রাজধানী জামে মসজিদে বাদশাহর শানে কাসীদা পড়ে শুনাচ্ছিলেন। লোকদের ভীড় জমে ওঠেছিলো। সে যুগের কবিতা ছিলো ব্যক্তির প্রশংসা গাঁথা। লাইছ এ দৃশ্য থেকে কবি আম্মারকে ডাকলেন। তাঁর কবিতা শুনলেন। তারপর তাঁকে বললেন, প্রশংসা গাইতে হয় একমাত্র আল্লাহর, মানুষের নয়। তাকে দিরহামের একটি থলি দিয়ে বললেনঃ আজ থেকে মানুষের প্রশংসায় কবিতা বলা বন্ধ করো। ইনশাল্লাহ প্রতি বছর আমি তোমাকে এই পরিমাণ পাঠাতে থাকবো। কবি আম্মারের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আগামীতে আর কোনো ব্যক্তির প্রশংসা করবেন না। ইমাম লাইছ আজীবন তার এই ওয়াদা পালন করে গিয়েছিলেন।

ইমাম লাইছ বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। কেবল কৃষিক্ষেত্র থেকেই তিনি পেতেন প্রতিবছর চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দীনার। এছাড়া তার ব্যবসাও ছিলো। সেখান থেকেও ছিলো একটা মোটা অংকের বার্ষিক আয়। এসব মিলিয়ে তাঁর বার্ষিক আয় ছিলো প্রায় সত্তর-আশি হাজার দীনার। কিন্তু তিনি অর্থ জমা করে রাখতেন না। বরং উপার্জিত সমস্ত অর্থ বছর শেষ হবার আগেই ছাত্র, ইলমী গবেষক ও অভাবীদের পেছনে ব্যয় করে ফেলতেন। এমনভাবে অর্থ ব্যয় করতেন যে, বছর শেষ যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকতো না। তার যাকাত দেবার প্রয়োজন হতো না। বরং কখনো নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ঋণ করতে হতো। ইমাম মালেককে প্রতিবছর একশ' দীনার পাঠাতেন। একবার শিশুদের কাপড় রঙীন করার জন্য ইমাম মালেক উসফুর চেয়ে পাঠালেন। উসফুর

এক প্রকার রঙদার ঘাস, যা কেবল মিসরেই পাওয়া যায়। লাইছ এতো বিপুল পরিমাণ ঘাস পাঠালেন যে, শিশুদের কাপড়-চোপড় ছাড়াও ঘরের মেয়েরাও তাদের সমস্ত কাপড় রাঙ্গিয়ে নিলেন আশপাশের প্রতিবেশীদের দিলেন এবং এরপরও ঘাস রয়ে গেলো, যা বিক্রি করে এক হাজার দীনার পাওয়া গেলো।

একবার এক ভদ্রমহিলা তাঁর অসুস্থ স্বামীর জন্য তার কাছে এক পেয়ালা মধু চেয়ে পাঠালেন। ইমাম তাঁর সেক্রেটারীকে বলে দিলেন, এই ভদ্রমহিলাকে এক মাতার (অর্থাৎ এক মণ বারো সের) মধু দিয়ে দিন। সেক্রেটারী এতো বিপুল পরিমাণ মধু দিতে আপত্তি জানালো। জবাবে তিনি বললেন, ঐ মহিলা তার মানসিকতা অনুযায়ী চেয়েছে, আমরা আমাদের মানসিকতা অনুযায়ী দেবো।

মেহমানদারীতেও তার তুলনা ছিলো না। কখনো মেহমান ছাড়া খাবার খেতেন না। এমনকি মেহমানকে বিদায় করার সময় তাকে পাথেও দিয়ে দিতেন। গৃহে বা বাইরে সফরে সবসময় তার লঙ্গরখানা জারী থাকতো। তবে তিনি নিজে অতি সরল ও সাধারণ জীবনযাপন করতেন। মুহাম্মদ ইবনে মুআবিয়া বলেন, একবার লাইছ তাঁর গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন (মিসরে গাধার সওয়ারী আজো পছন্দনীয় এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি গাধা এখন মিসরেই পাওয়া যায়) আমি তার সওয়ারী ও জিনিসপত্রগুলোর মূল্য হিসাব করে দেখলাম। সবগুলোর দাম বড়জোর আঠার কি বিশ দিরহাম হবে।

ইমাম লাইছ তাবেঈদের থেকে বহু হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীস পর্যালোচনা ও সমালোচনার কঠোর মানদন্ডে যাচাই করে ইমাম লাইছ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এই মানদন্ডে তিনি সবদিক দিয়ে পুরোপুরি উতরে গেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুইছ তাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সৎ ও নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ঃ হাদীসের নির্ভুলতা সংরক্ষণ ও উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে সমগ্র মিসরে তার জুড়ি নেই। অর্থাৎ রাজ দরবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা তার হাদীস বর্ণনা এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সমর্থনদানের উপর কোনো প্রভাব ফেলেনি।

প্রথম যুগের আলেমগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন

তাউস ইবনে কাইসান ছিলেন একজন প্রবীণ তাবেয়ী। অন্তত পঞ্চাশ জন সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁদের জ্ঞানের উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ইলমে ফিকহে তাঁর মর্যাদার আসন অতি উচ্চে। ইসলামী বিশ্বের দূর-দূরান্তে তাঁর ফিকহ জ্ঞানের চর্চা হতো। সমকালীন মুসলিম আলেম সমাজে তাঁর ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো।

প্রথম জীবনে তাঁকে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে হয়েছিল। তাঁর পিতাও ছিলেন ক্রীতদাস। দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী ও সুঠামদেহী।

তাউস তাঁর যুগের প্রবীণ ইমামগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান, হেদায়াত ও ফিকহ শিক্ষা করার জন্য সবসময় শত শত শিক্ষার্থী তাঁর চারপাশে ভীড় জমাতো। তাঁর প্রত্যেকটি কাজ অন্যদের জন্য আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হতো। তখন বনী উমাইয়ার স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন চলছিল। আলেম, ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের অধিকাংশই এই স্বৈরশাসকদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করতেন না। তাদের প্রদত্ত কোন উপহারও গ্রহণ করতেন না। কারণ রাষ্ট্র ও জনগণের রাজনৈতিক জীবনের নেতৃত্বের আসন থেকে দ্বীনকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সমাজের নেতৃত্ব এমন সব লোকদের হাতে চলে গিয়েছিল যারা নিজেদের লোভ ও স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যাপৃত ছিলো। তারা চাচ্ছিল সমাজ চলবে তাদের মর্জিমাফিক। আলেম, ফকিহ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে নিজেদের স্বার্থদ্ধোরের হাতিয়ারে পরিণত করেই তারা এ কাজে সফলকাম হতে পারতো। এই ফকিহগণ ক্ষমতাসীনদেরকে এড়িয়ে চলতেন। দ্বীন ও জনগণের কল্যাণের খাতিরে তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখলেও তাদের হাদিয়া ও তোহফা গ্রহণ করতেন না। অথচ নিজেদের জায়গায় তারা ছিলেন শক্তিশালী মনোবলের অধিকারী। সামান্য তোহফা গ্রহণ করলেও তাঁরা তাদের স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ারে পরিণত হতেন না, এতটুকুন সাহস ও মনোবল তাঁদের ছিলো। শাসকদের মুখোমুখি যখনই তাঁরা হয়েছেন, হক কথাই বলেছেন, তা তারা যতবড় স্বৈরাচারী ও জালেমই

হোন না কেন। তাদের রক্তচক্ষুকে কখনো ভয় পাননি। এরপরও তাদের অনুদান বা মেহেরবানী গ্রহণ করেননি, যাতে জনগণের দৃষ্টিতে তাদের অন্যায় কার্যক্রম সামান্যতম বৈধতাও লাভ করতে না পারে।

ইয়ামনের গভর্ণর মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ শাহী দরবারে বসে আছেন। পাহারাদার খবর দিলেন, তাউস ইবনে কাইসান ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ তাশরিফ এনেছেন। মুহাম্মদ এগিয়ে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদেরকে নিজের মসনদের পাশেই বসালেন। শীতকালের সকালবেলা। আকাশে সূর্যও উঁকি দেয়নি। কাজেই শীতের আমেজ ছিল একটু বেশি। তাউসের গায়ে কোন শীতবস্ত্র ছিলো না। মুহাম্মদ তার গোলামকে হুকুম দিলেন। একটি মূল্যবান আলোয়ান এসে গেলো এবং তাউসের গায়ে তা জড়িয়ে দেয়া হলো।

তাউস মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর চেহারায় ভেসে উঠলো বিরক্তি। তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। আস্তে আস্তে আলোয়ান সটকে যেতে লাগলো এবং এক সময় শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলো। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠলো। দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিলো। এতবড় দুঃসাহস, যাকে মর্যাদা দিতে চাই সে করে চরম অপমান! আর এ মুহাম্মদ তো আর কেউ নয়, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফির ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সাকাফি। খুনী পরিবারের সদস্য। একসময় যার জুলুম ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী দূর-দূরান্তের মানুষের মনে ভীতি ও শংকা জাগিয়ে তুলেছিলো। তার মুখের কথাই হতো আইন এবং তার একটি মাত্র ইশারায় ধড় থেকে মাথাটা আলাদা হতে এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগতো না।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ মুহাম্মদের রক্তচক্ষু দেখে মনে মনে কেঁপে উঠলেন। গভর্ণরের গোলামও প্রভুর দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন কেবল হুকুমের অপেক্ষা, ব্যস, তারপর একটি আঘাতেই সব শেষ। কিন্তু তাউসের কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি নিশ্চিন্তে বসে আছেন।

বাইরে আসার পর ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বললেন ঃ যদি আপনার আলোয়ানের দরকার নাই থেকে থাকে, তাহলেও বা কি? গভর্ণরকে নারাজ করা কি এতই অপরিহার্য ছিলো? ওটা নিয়ে নিতেন। কাউকে দিয়ে দিতেন অথবা বিক্রি করে দামটা মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

জবাব দিলেনঃ "যদি এ আশংকা না থাকতো যে, আমার পরে লোকেরা এ কাজকে জালেমের তোহফা কবুল করার বৈধতার ছাড়পত্র হিসেবে ব্যবহার করবে, তাহলে আলোয়ান গ্রহণ করতাম"।

উমাইয়া বাদশাহ সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেকের একটি ঘটনা। হজ্জের মওসুম চলছিল। সুলাইমান দেখলেন, এক ব্যক্তি কাবা শরীফে তাওয়াফ করছেন। চেহারাটি অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। কোনো বড় আলেম মনে হচ্ছিল। তাঁকে ঘিরে আরো বহু লোক তাওয়াফ করছে। ইমাম যুহরী সুলাইমানের সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞস করলেন, কে এই ব্যক্তি?

যুহরী বললেন, ইনি তাউস ইয়ামানী। বড় বড় সাহাবাগণের সাহচর্য লাভ করেছেন।

সুলাইমান তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য লোক পাঠালেন। তাউস নিজেই চলে এলেন। সুলাইমান আবেদন জানালেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস আমাকে শুনান।

তাউস বললেন, আমি আবু মুসা আশআরী থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর জন্য সবচেয়ে সহজ সৃষ্টি হবে সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ তার ওপর আল্লাহর আযাবের কোড়া যে কোন সময় বর্ষিত হতে পারে) যাকে মুসলমানদের বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং সে ইনসাফ ও সুবিচারের পরোয়া করে না।"

সুলাইমানের কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়। কিন্তু মাথা ঝুঁকিয়ে নেন। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বলেন, আর একটি হাদীস শুনান।

তাউস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে থেকে একজন (অর্থাৎ হযরত আলী) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের এক মজলিসে আমাকে খাবার দাওয়াত দিলেন। তারপর তিনি বললেন, কুরাইশদের ওপরও কুরাইশদের হক আছে। আর এই হক ততক্ষণ পর্যন্ত আছে যতক্ষণ তারা অর্থাৎ কুরাইশরা দয়া প্রার্থীদের প্রতি দয়া করে, শাসকের মসনদে বসলে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে, তাদেরকে আমানত সোপর্দ করা হলে তারা তার হেফাজত করে। যদি তারা এমনটি না করে তাহলে আল্লাহ, ফেরেশতা ও

সমস্ত মানুষের লানত বর্ষিত হয় তাদের প্রতি। যদি তারা এই লানতের ভাগী হয় তাহলে এরপরে আল্লাহ্ আর কিছুই গ্রহণ করবেন না।"

সুলাইমানের মাথা আবার নত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে বলেন, আর একটি হাদীস শুনান।

তাউস বললেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রঃ) আমাকে বলেছেন, কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াতটি নাযিল হয় সেটি হচ্ছে ওয়াত্তাকু ইয়াউমান তুরজাউনা ফীহে ইল্লাল্লাহ্, ছুম্মা তুওয়াফফা কুল্লু নাফসিম মা-কাসাবাত ওয়াহুম লা-ইউযলামুন।

অর্থাৎ "সেই দিনের ভয় করো যেদিন তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে আল্লাহর দিকে এবং তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পুরাপুরি বদলা দেয়া হবে এবং কারোর প্রতি জুলুম করা হবে না।"

গাফলতির সাগরে ডুবে থাকা সুলাইমানের স্বৈরাচারী হৃদয় কেঁপে ওঠে। তাঁর দু'নয়ন ছাপিয়ে অশ্রু নামে। মাথা নিচু করে নেন তিনি। এ ছিল ইসলামের প্রথম যুগের আলেম সমাজের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য সচেতনতা। তাঁরা জানতেন এবং বুঝতেন যে, ইসলামের ভুবন প্রতিনিধিত্বের দায়ভারের বিরাট অংশ তাঁদের ওপর বর্তাবে। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের তাঁরা আমানতদার। কাজেই নিজেদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এর বাস্তব প্রতিনিধিত্ব তাঁদেরকেই করতে হবে। তাঁরা সে প্রতিনিধিত্বের হক আদায়ও করেছেন। ফলে পরবর্তীকালে ইসলাম যথার্থ রূপেই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। বর্তমানেও আলেম সমাজ যদি তাঁদের দায়িত্ব সচেতন হন তাহলে বর্তমানে এবং আগামী দিনে ইসলাম তার যথার্থ রূপ অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবে। আলেম সমাজ অবশ্যই তাদের দায়ভার এড়াতে পারবেন না।

মদীনার ফকীহ্ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ইল্‌মের মর্যাদা সমুন্নত রাখলেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে মুসলমানদের মধ্যে যে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের প্রচলন হয় হিজরী প্রথমার্ধ শেষ হবার আগেই তার অবসান ঘটে। হিজরীর প্রথমার্ধের শেষ দিক থেকে শুরু হয় রাজতান্ত্রিক শাসন। জাহেলী রাজতন্ত্রের ধারাতেই এর প্রচলন হয় এবং তার পথেই বিকাশ শুরু হয়।

বনী উমাইয়া ছিলো মুসলমানদের প্রথম রাজবংশ। রাজার জীবদ্দশায় রাজপুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে তার সপক্ষে অগ্রিম বাইআত গ্রহণ করার রেওয়াজ বনী উমাইয়ার মধ্যে চলে আসছিল। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান বাদশাহ হবার পর তাঁর পুত্র ওলিদ এবং তারপরে সুলাইমানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তার পক্ষে বাইআত নেবার জন্য ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদেরকে দায়িত্ব দেন। এখান থেকেই বাদশাহর সাথে বিরোধ শুরু হয় কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ইমাম এবং মদীনার ফকীহ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের সাথে। এটা ছিল এমন একসময় যখন সাহাবাগণের অনেকেই জীবিত ছিলেন।

মদীনার গভর্ণর হিশাম ইবনে ইসমাইল মদীনাবাসীদেরকে বাইআত নেবার জন্য আহবান জানান। কিন্তু সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব সোজা অস্বীকার করে বসেন। তিনি বলেন, আবদুল মালেকের জীবদ্দশায় আমি দ্বিতীয় বাইআত করতে পারি না। তার অস্বীকৃতির কারণে সমস্ত মদীনাবাসীর বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। হিশাম তার ওপর চাপ দিতেই থাকলেন এবং হত্যা করার হুমকিও দিলেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব পাহাড়ের মতো অটল। শেষে গভর্ণর তিনটি প্রস্তাব দেন। এর যে কোনো একটি মেনে নিলেই চলবে। এক ঃ বাইআতের ফরমান জনতার সামনে পড়ে শুনানো হবে কিন্তু সাঈদ চুপ থাকবেন, হ্যাঁ বা না কিছুই বলবেন না। দুই ঃ তিনি কয়েকদিনের জন্য ঘরের বাইরে বের হবেন না। এর মধ্যে সমস্ত লোকের বাইআত গ্রহণ শেষ হয়ে যাবে। তিন ঃ তিনি ঘর থেকে মসজিদে চলে আসবেন এবং সরকারী বার্তাবাহক তাকে ঘরে না পেয়ে ফিরে চলে যাবে।

কিন্তু তিনি তিনটি প্রস্তাবই নাকচ করে দেন। প্রথমটির ক্ষেত্রে লোকেরা সম্ভবত তাঁকে নীরব দেখে ভাববে বোধ হয় তিনি বাইআত করে নিয়েছেন এবং তিনি এর বিরোধী নন। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তাঁকে সংশ্লিষ্ট কয়েকদিন জামায়াতের সাথে নামায পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আর তৃতীয়টির ক্ষেত্রে যদিও নিজেকে বাঁচার ভালোই কৌশল দেখা যায়, তাহলেও তার মতে, এ থেকে মনে হবে বুঝিবা তিনি মানুষের ভয়ে ভীত অথচ মানুষের কাউকে ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই।

সাঈদ জানতেন প্রস্তাব গ্রহণ না করার ফল কি হবে। কিন্তু রুখসাতের পথ পরিহার করে তিনি আযীমাত তথা দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করেন। আর প্রত্যেক যুগে এটিই হয় সত্যপন্থীদের পথ। হিশাম তাঁকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করেন এবং সারা শহরে ঘোরান। এর ফলে বন্ধুদের কয়েকজন বলেন ঃ সাঈদ! এতো বড়ই লজ্জা ও বেইজ্জতির কথা। জবাব দেন ঃ কিয়ামতের লজ্জা ও বেইজ্জতি মেনে নিয়েছি। এরপর হিশাম তাঁর প্রাণদন্ডের হুমকি দেন। এ হুমকিকে কার্যকর করার জন্য তাঁকে শূলে চড়াবার স্থান রাসুশ্ শানীয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনিও তহবন্দের ভেতরে জাংগিয়া পরে তৈরী হয়ে নেন, যাতে শূলদন্ডের পর কোনো অবস্থায় তার গোপন অঙ্গ দেখা না যায়। কিন্তু সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

জুলুম-নির্যাতনে তাঁকে দমাতে না পেরে উমাইয়া বাদশাহগণ অন্য পথ ধরেন। কিন্তু সাঈদ সবসময় তাদের থেকে দূরে থাকেন। বাদশাহ আবদুল মালেক কয়েকবার তাঁর সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। একবার হজ্জের সময় মদীনায় আসেন। মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং একজনকে পাঠান তাঁকে ডেকে আনার জন্য।

সে ব্যক্তি গিয়ে বলে ঃ আমিরুল মুমিনীন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চান।

সাঈদ বড়ই অবজ্ঞাসহকারে জবাব দেন ঃ আমার এমন কোনো প্রয়োজন নেই আমীরুল মুমিনীনের সাথে মোলাকাত করার। তবে তার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে তা পূরণ হবার নয়।

লোকটি গিয়ে কথাগুলো আবদুল মালেককে হুবহু শুনিয়ে দেয়। বাদশাহ আবার তাকে পাঠান। এবার তাকে বলে দেন, তিনি আসতে চাইলে ভালো কথা। নয়তো জোরজবরদস্তি করো না।

এবারও সাঈদের একই জবাব। বাদশাহর খাদেম তাঁর কথায় উত্তেজিত হয়ে বলেঃ আপনি তো বেশ লোক। আমীরুল মুমিনীন বারবার ডাকছেন, আপনি যাচ্ছেন না। আমাকে যদি কঠোরভাবে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি আপনার মাথা কেটে নিয়ে যেতাম।

সাঈদ নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন ঃ বেটা, যাও, আবদুল মালেক যদি আমাকে কিছু দিতে চায় তাহলে তা আমি তোমাকে দান করে দিলাম। আর যদি আমাকে কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ডেকে থাকে, তাহলে তাকে বলে দাও, আমি এখান থেকে নড়বোনা, তার যা করার ইচ্ছা করুক।

একথা শুনে আবদুল মালেক ক্রোধে ক্ষিপ্ত হন কিন্তু কিছুই করার সাহস পান না।

এরপর আবদুল মালেক আরো কয়েকবার চেষ্টা করেন তাঁর সাথে দেখা করার। কিন্তু বারবার প্রত্যাখ্যাত হন। শেষে একবার হজ্জের সময় ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যায়। আবদুল মালেক বলেন ঃ "আবু মুহাম্মদ! আমার অবস্থা এখন এমন হয়ে গেছে যে, কোনো ভালো কাজ করলে খুশী অনুভূত হয় না এবং খারাপ কাজ করলে দুঃখ ও আফসোস হয় না।" সাঈদ বলেন ঃ "এখন তোমার অন্তর একেবারেই মরে গেছে।"

আবদুল মালেকের পরে ওলিদের সাথেও তিনি একই ব্যবহার করেন। ওলিদ সিংহাসনে বসার পর মদীনা মুনাওয়ারায় আসেন। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখেন জনৈক শাইখের চারদিকে বিপুল জনতার ভিড়। জিজ্ঞেস করেন, কে এই বুযর্গ? বলা হয়, ইনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব। ওলিদ তাঁকে ডেকে আন্‌তে বলেন। সাঈদ বার্তাবাহকের সাথে যেতে রাজি হন না। বলেন, ওলিদের সাথে আমার কি দরকার? তিনি হয়তো অন্য কাউকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমাকে নয়। ওলিদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তাঁকে ধরে নিয়ে এসো। তাঁর সাথী বলেন, "আমীরুল মুমিনীন! সাঈদ হচ্ছেন মদীনার ফকীহ। কুরাইশদের শাইখ তিনি ভাংবেন কিন্তু মচকাবেন না। তিনি তো আপনার পিতার সামনেও ঝোঁকেননি। তাকে ঘাটবেন না।" ওলিদ তার হুকুম প্রত্যাহার করেন।

একবার বাইতুলমাল থেকে তিরিশ হাজার দিরহাম তাঁর খিদমতে পাঠান হয়। সাঈদ একটি দিরহাম গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন। বলেন, এমন জিনিস আমার দরকার নেই যা মানুষের অধিকার হরণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে।

একজন বলেন ঃ আপনার কি প্রাণের ভয় নেই। জবাব দেন ঃ খামুশ হয়ে যাও, আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করবেন না।

সাঈদের পিতা মুসাইয়েব এবং দাদা হাযান উভয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। সাঈদের জন্ম হয় হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফত আমলে। এটা ছিল এমন এক যুগ যখন সাহাবায়ে কেরামের পুত পবিত্র জীবন এবং তাদের ঈমান ও আমলের চর্চায় আকাশ-বাতাস মুখরিত ছিল। সাঈদ তাদেরই গুলবাগিচা থেকে খুশবুদার ফুল সংগ্রহ করেন। তিনি হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, সা'দ, ইবনে আব্বাস, আবু দারদা, সুহাইব, জাবের, আবু সাঈদ খুদরী, আসমা বিনতে আবুবকর, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা, উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা প্রমুখ সাহাবী ও মহিলা সাহাবীদের থেকে ইল্‌ম ও আমলের শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁকে ভিত্তি করে মদীনায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। মুসলিম বিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসুরা তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করার জন্য মদীনায় আসতে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন উমর ইবনে আবদুল আযীয, মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহ্‌রী, আমর ইবনে দীনার, আতা ইবনে বিরাহ, মুহাম্মদ ইবনে বাকের ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (রাঃ) কোনো মাসআলাহ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, সাঈদকে জিজ্ঞেস করো।

এ থেকে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সংগে তিনি পার্থিব স্বার্থবাদী ও জালেমের সামনে নত না হয়ে নিজের ইল্‌ম ও জ্ঞানকে মর্যাদার আসনে বসান।

ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) ব্যবসায়িক সফলতা

হিজরী দ্বিতীয় শতকে ফিকহ ও আইন শাস্ত্রে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান নেতা ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি খুয নামক এক প্রকার কাপড়ের ব্যবসা করতেন। ইসলামের প্রথম শতকে মুসলমানদের মধ্যে খুয কাপড়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল। খুয কাপড় রেশমের সুতায় তৈরি হতো এবং তার সাথে মেশানো হতো উল, পশম ও তুলার সূতা। আবার কারোর কারোর বর্ণনা মতে খুয এক প্রকার সামুদ্রিক জীবের গাত্রাবরণ থেকে তৈরি পশমের সূতায় বোনা কাপড়। মূলত খুয রেশমী কাপড় বলেই পরিচিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুযর্গ ছাড়া বাকি সবাই খুয ব্যবহার করতেন। এই কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, রেশমের চেয়ে বেশি টেকসই হতো। আর রেশম ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে হারাম। তাই এর ব্যবহারের বৈধ পন্থা বের করার জন্য রেশমের সাথে অন্যান্য উপাদান মেশানো হতো।

ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) এই কারবার কতদূর বিস্তৃত ছিল? তিনি এই মূল্যবান বস্ত্রের ব্যবসায় কিভাবে করতেন? বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এ সম্পর্কে চারটি বিষয় জানা যায়।

একঃ ইমাম সাহেব কেবল রেশমী বস্ত্রের ব্যবসায়ীই ছিলেন না। বরং তিনি এই রেশমী বস্ত্র তৈরি করার জন্য কুফায় নিজস্ব কারখানাও নির্মাণ করেন। **দুইঃ** কুফার বাজারে তাঁর দোকান ছিল। **তিনঃ** দাসদের দ্বারা ফেরি করেও তাঁর কাপড় বিক্রি হতো। **চারঃ** বহু দূরদূরান্ত যেমন বাগদাদ, নিশাপুর ইত্যাদি আন্তর্জাতিক নগরে এগুলো রফতানি করা হতো এবং সেখান থেকে তিনি অন্যান্য পণ্য দ্রব্যাদি আমদানিও করতেন।

কুফার বাজারে জামে মসজিদ সংলগ্ন ছিল তাঁর দোকান। আর এই দোকান কেবল পণ্য সামগ্রী কেনাবেচার একটি আড়ত ছিল না। বরং সাধারণের নিকট এটি সাহাবী আমর ইবনে হারেছের (রাঃ) কুঠি হিসেবে পরিচিত ছিল। এর মধ্যে একদিকে কারখানা ছিল, যেখানে বস্ত্র তৈরি হতো। অন্যদিকে ছিল বস্ত্রবয়নকারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের বাসস্থান। তারপর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কাউন্টার ও দোকানও ছিল। বাইরের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের বস্ত্রও তিনি এখানে বসে কিনতেন। ইমাম সাহেবের রেশমী

বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসায় পরিচালনায় এ সাফল্য দেখে তৎকালীন আব্বাসীয় হুকুমাত তাঁকে রেশমী বস্ত্র বয়নকারীদের তত্ত্বাবধায়কের চাকরি দিতে চান বলে জামেউল মাসনীদে আবু বকর আইয়াশ উল্লেখ করেছেন। সরকারী এ চাকরি গ্রহণে অস্বীকার করার কারণে তাঁকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।

সেই যুগে কুফার জনসংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। কুফা ও বসরা শহর দুটি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে আবাদ করা হয়। মূলত এদুটি ছিল দুটি মুসলিম সেনানিবাস। ধীরে ধীরে অর্ধ শত বছরের মধ্যে শহর দুটিতে ব্যাপক জনবসতি গড়ে ওঠে এবং এদুটি মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান চর্চা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময় কুফা শহরে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) দোকানই ছিল শ্রেষ্ঠ ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র এবং জনগণের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি কেবল কুফার ফকীহ হিসেবে নয়, ব্যবসায়ী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

মদীনা থেকে এক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সওদা করার জন্য কুফায় আসেন। তিনি ভালো রেশমী বস্ত্রের খোঁজ করলে লোকেরা জানায় এ ধরনের উন্নত মানের বস্ত্র এখানকার ফকীহ ইমাম আবু হানিফার দোকান ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তারপর সেখানকার কেনাবেচা সম্বন্ধেও লোকেরা তাঁকে অগ্রিম জানিয়ে দেয় এই বলে যে, সেই দোকানে যাওয়ার পর তোমার প্রার্থিত বস্ত্র বের করে দিলে যে দাম বলবে সেই দামেই তোমাকে কিনতে হবে। অর্থাৎ সেখানে বেচাকেনার জন্য প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য নির্ধারিত ছিল। এতে দুটো লাভ ছিল। প্রথমত সময় ক্ষেপণ হতো না। কম সময়ে কাজ শেষ হতো। দ্বিতীয়ত ক্রেতা প্রতারণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতো।

ইমাম সাহেব ছাড়াও তাঁর ছেলে হাম্মাদ এবং তাঁর কয়েকজন ছাত্রও দোকানে কেনাবেচা করতেন। রেশমী বস্ত্র ছাড়াও অন্য যে সব পণ্য তাঁর দোকানে থাকতো, লোকদের চাহিদামতো তিনি তা সরবরাহ করতেন। ৩৩০ হিজরী সনে মৃত্যু বরণকারী মুহাম্মদ ইবনে সা'দ তাঁর গ্রন্থে সাহাবী আমর ইবনে হারেসের (রাঃ) সেই কুঠি সম্পর্কে লিখেছেন, এই গৃহে রেশমী বস্ত্র বয়নকারীরা এখনো পর্যন্ত আছে। অর্থাৎ এটা অত্যন্ত জমজমাট ব্যবসা ছিল এবং ইমাম সাহেবের পরেও কয়েক পুরুষ পর্যন্ত এ ব্যবসা চলেছিল।

ইমাম সাহেব তাঁর দাসদের দিয়েও ব্যবসা করতেন। তাঁর এক দাসকে ব্যবসা করার জন্য তিনি বহু পরিমাণ পণ্যদ্রব্য দিয়ে রেখেছিলেন। একবার সেই দাস তিরিশ হাজার দিরহাম মুনাফা করলো। এ থেকে বুঝা যায়, ব্যবসায়ে দাসরা কি পরিমাণ অর্থ রোজগার করতো। সে যুগে মালিকরা দাসদের দিয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। তাদেরকে পণ্যদ্রব্য দিয়ে বিভিন্ন শহরে পাঠিয়ে দেয়া হতো। এই সব ব্যবসায়ী গোলামদের জন্য ফিকহবিদদের বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন করতে হয়। ইমামুল আয়িম্মা হযরত আবু বকর যানজাবী তাঁর একজন গোলামকে পণ্যদ্রব্য দিয়ে ব্যবসা করতে পাঠিয়েছিলেন। সে একবার সত্তর হাজার দিরহাম মুনাফা নিয়ে ফিরে এলো। সত্তর হাজার দিরহাম আজকের প্রায় পনের থেকে বিশ লাখ টাকার সমান।

নিশাপুরের ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাফস ইবনে আব্দুর রহমানের সাথে ইমাম আবু হানিফার যৌথ কারবার ছিল। তিনি নিশাপুর থেকে ইমাম সাহেবের কাছে পণ্য প্রেরণ করতেন এবং ইমাম সাহেব কুফা থেকে তাঁর কাছে পণ্য পাঠাতেন। তাদের এ যৌথ ব্যবসা তিরিশ বছর পর্যন্ত চলেছিল। হাফস ইবনে আব্দুর রহমান ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার নিকট থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

বাগদাদে ইমাম সাহেব পণ্য রফতানি করতেন। তবে সেখানে তাঁর কারবারের কেউ অংশীদার ছিল কিনা তা জানা যায়নি। মনে হয় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তাদের মাধ্যমে পণ্য আনা-নেয়া করতেন। বাগদাদ ও নিশাপুর ছাড়া তৃতীয় যে শহরে তার কারবার ছড়িয়ে পড়েছিল সেটি ছিল মার্ভ। মার্ভের কাযী আবু গানীম ছিলেন সেখানে ইমাম সাহেবের কারবারী প্রতিনিধি। আবু গানীম খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহর সাহচর্যে থেকে উপকৃত হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। আবু গানীম প্রখ্যাত ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের উস্তাদ ছিলেন। আবার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ইমাম আবু হানিফার (রঃ) ও ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৫৯ হিজরীতে ইমাম আবু হানিফার মৃত্যুর নয় বছর পরে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম সাহেবের নিকট থেকে হাদীসও বর্ণনা করতেন।

ইমাম সাহেবের ব্যবসায় প্রতিনিধিরা বিভিন্ন নগর সফর করে তাঁর পণ্য বিক্রি করতেন। হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক এবং এর পরবর্তীকালে আরো কয়েকশ বছর পর্যন্ত দেখা যায় ইমাম, ফকীহ, আলেম ও মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাঁদের অনেকে শ্রেষ্ঠ ঈমানদার ও সফলকাম ব্যবসায়ী হিসেবে সমকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আলেম ও ফকীহগণ কারোর গলগ্রহ ছিলেন না। তাঁরা ব্যবসা করতেন আবার ইল্‌ম চর্চাও করতেন। ব্যবসায় তাঁদের ইলম বিস্তার ও তার বাস্তবায়নের একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ ব্যবসায় ক্ষেত্রকে তাঁরা আবিলতা ও কলুষমুক্ত করেছিলেন এবং একে একটি হালাল জীবিকায় পরিণত করেছিলেন। হালাল জীবিকার ভিত্তিতে ইসলাম যে একটি সূচি-সুন্দর পূত-পবিত্র সমাজ গঠন করতে চায় এর প্রবক্তারা বাস্তবে এর দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন।

শরীয়তের আইন প্রয়োগে বিচারপতিদের অবদান

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় ইসলামী রাষ্ট্রের তিনিই ছিলেন প্রধান বিচারপতি। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে তিনি আরো যাকে যাকে চেয়েছেন বিচারক নিযুক্ত করেছেন অথবা তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষের সমস্যা ও ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করার অনুমতি দিয়েছেন।

খিলাফাতে রাশেদের আমলেও খলিফারাই ছিলেন প্রধান বিচারপতি। তারা বিভিন্ন শহরে ও অঞ্চলে বহু সাহাবা ও প্রবীণ তাবেঈদেরকে বিচারক নিযুক্ত করেন। তারা সবাই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিষ্ঠার সাথে পালনও করেন। তাদের কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাননি এবং দায়িত্ব এড়াবার জন্য দূরে পালিয়েও যাননি।

কিন্তু খিলাফতের পরে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও পারিবারিক রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হলো তখন দেখি আমরা এর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা। তখন উলামা, ফকীহ ও মুজতাহিদগণ এই বিচারকের পদটি এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। তাদের অনেকেই এ পদটি গ্রহণ না করার কারণে রষ্ট্রদ্রোহিতা ও রাজদ্রোহিতায় অভিযুক্ত হয়ে কারাদন্ড ও শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন।

ইসলামে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। খিলাফতের পরে রাজতান্ত্রিক আমলেও এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু রাজতান্ত্রিক আমলে এর প্রয়োগ সন্দেহযুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে উলামা ও ফকীহগণ এ পদটি এড়িয়ে চলতে থাকেন। আইন রচিত হচ্ছে যথার্থভাবে ঠিকই, কিন্তু এর প্রয়োগ বাদশাহ যদি নিজস্ব প্রভাব খাটাতে চান তাহলে এর ফলে মানুষের জন্য তা লাভের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে। কাজেই, এ ক্ষেত্রে বিচারকের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবেন তাদের একদিকে যেমন হতে হবে সত্যপন্থী, হক্কানী আলেম, তেমনি অন্যদিকে নির্ভীকতার সাথে সাথে যুক্তিবাদিতার ক্ষেত্রেও হতে হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাদশাহ বা প্রশাসনযন্ত্রের কোনো অংশ যদি নিজস্ব প্রভাব খাটাতে উদ্যত হয়, তাহলে কাজী বা বিচারক প্রথম অবস্থাতেই ইসলামী শরীয়তের যুক্তিবাদী ধারায় তাকে নিরস্ত্র করবেন।

খিলাফতের পরে রাজতন্ত্র একটি পৃথক পদ্ধতি ছিলো এবং এটি ছিলো একটি জাহেলী যুগের পদ্ধতি। স্থায়িত্ব লাভ করার পর এর ইসলামীকরণের প্রশ্ন ছিলো। ইসলামী শরিয়তের পরিবর্তনের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না বরং এই রাজতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিলো। বিচার বিভাগ এবং ইসলামী আইনের প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে ছিলো একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রথম যুগে অর্থাৎ হিজরী প্রথম তিন চারশ' বছরে এ কাজটি চলেছে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। একদিকে একদল ফকীহ কাজীর পদ গ্রহণ করছেন। ফলে এ পদটির দায়িত্বশীলতা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। যারা এ পদের দিকে আসছেন তারা নিজেদের দায়িত্ব অনুভব করছেন। আর সেটি ছিলো এমন এক যুগ যখন কুরআন ও হাদীস এবং নবী ও সাহাবাগণের জীবন ও কর্মের সাথে মুসলমানদের সরাসরি সম্পর্ক ছিলো। সেটি ছিলো খাইরুল কুরুন এবং তার কাছাকাছি সময়।

বাদশাহ হারুনর রশীদের শাসনামলে ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন এমনি একজন দায়িত্বশীল ফকীহ। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় খিলাফতের চীফ জাস্টিজ। চেহারা-সুরাতে তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে হতো। চিকন ছিপছিপে চেহারার। উচ্চতায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির বেশি নয়। কিন্তু এই সামান্য মানুষটিই বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক থেকে ছিলেন যেনো

একটি বিশাল পাহাড়। এ পাহাড় লজ্ঘন করা ছিলো অতি কঠিন ব্যাপার। অধ্যাপনা ও ফিকহ্ আলোচনার মসনদে যখন বসতেন তখন মনে হতো নিজের আশপাশের পরিবেশের মধ্যেই তিনি ডুবে গেছেন কিন্তু যখন মোকদ্দমার শুনানি হতো বা ফায়সালা শুনাতেন তখন তার জ্ঞান, তীক্ষ্ম মেধা ও বিচক্ষণতা মানুষকে বিস্ময়াবিষ্ট করে ফেলতো। তার চিকন শরীর দেখে লোকেরা বলতো ঃ আল্লাহ যদি চান তাহলে পাখির পেটেও জ্ঞান ভর্তি করে দেন।

একবারের ঘটনা। প্রধান বিচারালয়ের ইজলাস চলছে। প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ মোকদ্দমার ফায়সালা শুনাচ্ছেন। বাদশাহ হারনুর রশীদের একটি মোকদ্দমার শুনানি চলছিলো। এই মোকদ্দমায় বাদশাহর পক্ষে সাক্ষী ছিলেন তার প্রিয় মন্ত্রী ফযল ইবনে রবী। ইমাম আবু ইউসুফ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফযলের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেলো। তিনি বাদশাহর কাছে গিয়ে নালিশ করলেন, আবু ইউসুফ আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। হারুন ফযলের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে ইমাম সাহেবকে তলব করলেন। আদালতের কাজ শেষ করে ইমাম বাদশাহর দরবারে এলেন।

বাদশাহ ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ফযলের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন কেন?

'আমীরুল মুমিনীন' ইমাম আবু ইউসুফ বললেন, "একবার আমি শুনেছিলাম, ফযল আপনাকে বলছে, আমি আপনার গোলাম। যদি সে তার বক্তব্যে সত্যবাদী হয়, তাহলে ইসলামী শরীয়তে প্রভুর পক্ষে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তো মিথ্যুকের সাক্ষ্য কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি আপনার সামনে নির্ভিক চিত্তে মিথ্যা বলতে পারে সে আমার সামনে যে মিথ্যা বলবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?"

বাদশাহর ক্রোধের আগুনে যেনো এক মণ পানি ঢেলে দেয়া হলো। ইমাম সাহেবের কাছে কৈফিয়ত তলব করার জন্য তিনি এখন নিজেই ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

একবার বাগদাদের জামে মসজিদে বাদশাহ হারুনর রশীদ জুমার নামাযের খুতবা দিচ্ছিলেন। সবাই মনোযোগ সহকারে শুনছিলো। হঠাৎ

এক যুবক দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো ঃ "আল্লাহর কসম, আপনি ধন-সম্পদ ঠিক মতো বন্টন করেননি। মানুষের মধ্যে ইনসাফও কায়েম করেননি। অন্যায় ও অসৎ কর্মে আপনার দু'হাত সিক্ত হয়ে গেছে।" হারুন ক্রোধে ফেটে পড়লেন। হুকুম দিলেন, ধরো ওকে। সঙ্গে সঙ্গেই সশস্ত্র রক্ষীদল সত্য বলার অপরাধে যুবককে গ্রেফতার করলো। নামাযের পর অপরাধীকে বাদশাহর সামনে পেশ করা হলো। বাদশাহ প্রধান বিচারপতিকেও ডেকে আনার হুকুম দিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ এজলাসে প্রবেশ করে একনজর পরিবেশটা যাচাই করলেন। বাদশাহ ক্রোধে অগ্নিশর্মা। অপরাধী যুবক সোজা দাঁড়িয়ে আছে যেনো এক নিশ্চল মূর্তি। তার দু'দিকে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী দু'দিক থেকে তাকে এমনভাবে ধরে আটকে রেখেছে যেনো সে খাঁচায় বাঁধা। পেছনে দু'জল্লাদ কোড়া হাতে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র হুকুমের অপেক্ষায়।

বাদশাহ অভিযোগ দায়ের করলেন ঃ এই গোস্তাখির কি শাস্তি হতে পারে? সে আমার সাথে এমন বেআদবী করেছে যা করার সাহস ইতিপূর্বে কেউ করেননি।

ইমাম সাহেব সব ঘটনা শুনলেন তারপর ধীরকণ্ঠে বললেনঃ আমিরুল মুমিনীন! একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণিমতের মাল বন্টন করছিলেন। এক বদ্দু উঠে দাঁড়িয়ে বললো ঃ "এ বন্টন আল্লাহর মর্জি মাফিক হয়নি। আপনি ইনসাফ করেননি।" আমীরুল মুমিনীন! বড়ই কঠিন কথা ছিলো, যা সেই বদ্দু বলেছিলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দিলেন। তবে তিনি কেবল এতোটুকু বললেন, "যদি আমি ইনসাফ না করি তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?"

"আমীরুল মুমিনীন! একবার হযরত যুবাইর ও এক আনসারী তাদের বিবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করলেন। নবী (সাঃ) হযরত যুবাইয়ের পক্ষে রায় দিলেন। আনসারী রুষ্ট হয়ে বলে ফেললোঃ নিজের ফুফাতো ভাইয়ের পক্ষে রায় দিলেন। কিন্তু নবী (সাঃ) এই গোস্তখীর জন্য তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। তাকে মাফ করে দিলেন।"

ইমাম আবু ইউসুফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র মাধুর্য বর্ণনা করছিলেন এবং বাদশাহর চেহারার রক্ত বদলে যাচ্ছিলো।

ধীরে ধীরে তার ক্রোধ প্রশমিত হলো। তিনি যুবকটিকে মুক্ত করার হুকুম দিলেন।

এভাবে প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ ইসলামী আইন প্রয়োগে বাদশাহকে সাহায্য করলেন। যদিও শাসনতন্ত্র থেকে বিচার ব্যবস্থা আলাদা ছিলো এবং ইসলামী শরীয়ত সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলো কিন্তু রাজতন্ত্র ও এক নায়কতন্ত্রের বিশেষ প্রকৃতিই হচ্ছে সবকিছুকে গ্রাস করা। মুসলিম বিচারক, কাজী ও ফকীহগণই এই সর্বগ্রাসিতার কবল থেকে ইসলামী শরীয়তকে রক্ষার মাধ্যমে এর যথার্থ প্রয়োগকে নিশ্চিত করেছিলেন।

রাজতান্ত্রিক আমলের একজন নির্ভীক আলেম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক

হিজরী দ্বিতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একটি ঘটনা। আব্বাসীয় বাদশাহ হারুনর রশীদ তখন রাজধানীর বাইরে রিক্কা নগরীতে অবস্থান করছিলেন। রিক্কা ছিলো একটি বর্ধিষ্ণু নগরী। খবর এলো, গগনচুম্বী খ্যাতির অধিকারী যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী বিরল ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রিক্কাতে আসছেন। নগরীতে যেনো খুশীর জোয়ার এলো। পথেঘাটে লোকের ভিড় জমে উঠলো। আশপাশের লোকালয় থেকেও লোকেরা রিক্কার পথে পাড়ি জমালো। মোটকথা, রিক্কা নগরীতে এবং তার চারপাশে যেনো জনতার ঢল নামলো।

নগরের বাইরে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হলো। লোকেরা ঘোড়ার পিঠে, উটের পিঠে, গাধার পিঠে, পায়ে হেঁটে চলছিলো। মেহমানকে সাদরে নগরে প্রবেশ করানো হচ্ছিলো। মানুষ ও পশুর পদভারে সমস্ত নগরী প্রকম্পিত ছিলো। অত্যধিক জনসমাগমের কারণে বাতাস ধূলায় ধুসরিত হলো। লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিলো কে এগিয়ে গিয়ে ইবনে মুবারকের হাতে হাত মিলাবে। একজন অন্যজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলো কিন্তু কারোর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলো

না। শাহী মহলের সুউচ্চ বুরুজ থেকে বাদশাহর এক বাঁদি অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো। সে খাদেমদের জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি?

একজন বললো, খোরাসানের একজন আলেম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রিক্কায় আসছেন।

বাদীর কণ্ঠে স্বতস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হলো, আল্লাহর কসম! বাদশাহ তো এই ব্যক্তি। হারুন কেমন বাদশাহ, যে পুলিশ ও সৈন্যদের সহায়তা ছাড়া জনসমাগম করতে পারে না।

এটা ছিলো তাবাতাবেয়ীদের যুগ। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত খাইরুল কুরুনের একটি অংশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য যে সাহাবাগণ লাভ করেছিলেন, তাদের থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন যে তাবেয়ীগণ তাদের যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। শুরু হয়েছিলো তাবেয়ীদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাদের সযত্ন পরিচর্যায় গড়ে ওঠা তাবা-তাবেয়ীদের জামানা।

এই যুগেই গড়ে ওঠেছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক। তাঁর পিতা মুবারক একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, আমানতদার ও সত্যপ্রিয়। তার প্রভু সভ্যতা ও আমানতদারীর কারণে তাকে ভালোবাসতেন এবং সম্মানও করতেন। প্রভুর একটি কন্যা ছিলো বিবাহযোগ্য। চতুর্দিক থেকে তার বিয়ের পয়গাম আসছিলো। তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কোন্ পাত্রটি পছন্দ করবেন নিজের মেয়ের জন্য। একদিন তিনি মুবারকের কাছে পরামর্শ চাইলেন, কোন্ পাত্রটি মেয়ের জন্য পছন্দ করা যায়?

মুবারক জবাব দিলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা বংশ মর্যাদা খুঁজে ফিরতো। ইহুদীরা ধনাঢ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়তো। খৃষ্টানরা রূপ-সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতো। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীয়ার দৃষ্টিতে দ্বীন, ঈমান ও তাকওয়াই শ্রেষ্ট মানদন্ড। আপনি এর মধ্য থেকে যে কোনোটি বেছে নিতে পারেন।

মুবারকের সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ তার প্রভুর মনঃপুত হলো। তিনি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। স্ত্রীর কাছে গেলেন। তাকে বললেন, আমরা মেয়ের জন্য পাত্র পছন্দ করতে পারছিলাম না। আমার মতে,

মুবারকের চেয়ে ভালো পাত্র আর পাওয়া যাবে না। সে দ্বীনদার, মুত্তাকী, আমানতদার ও জ্ঞানী। স্ত্রীও ছিলেন দ্বীনদার ও মুত্তাকী। বিশেষ করে মুবারকের উন্নত চরিত্রের কারণে তিনি তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন। তাদের মেয়েও পাত্র পছন্দ করলো। ফলে প্রভু কন্যার সাথে মুবারকের বিয়ে হয়ে গেলো।

এই নেকবখত কন্যার গর্ভে ও জ্ঞানবান পিতার ঔরসে আবদুল্লাহর জন্ম। কোথায় ক্রীতদাস আর কোথায় প্রভু। প্রভু ও দাসের সম্মিলনে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, আলেম, ফকীহ ও আল্লাহর হুকুমের প্রতি নিবেদিত প্রাণ যুগস্রষ্টা মনীষীর জন্ম। এটা ইসলামের আঙিনায় সম্ভব হয়েছে। অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ বা জাতিগোষ্ঠীর আঙিনায় এটা সম্ভব নয়। দুনিয়া থেকে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। এটা নিছক যুগের দাবী বলে তাই। নয়তো প্রভু মনোবৃত্তি আজো খতম হয়ে যায়নি। বিশ শতকের সভ্যতাগর্বী বড় বড় জাতিদের মধ্যে যথারীতি এ প্রবণতা প্রবলভাবে কার্যকর রয়েছে। সাদা-কালোর পার্থক্য এরই ভিন্নতর রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামের নবী সর্ব যুগের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে চিরতরে খতম করে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, আজমীর উপর আরবীর এবং কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সামাজিক অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি প্রভু ও দাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। মুসলমানদের সমাজ সেভাবেই গড়ে ওঠেছে। তাই একজন প্রভু তার প্রাণপ্রিয় কন্যাকে তার অধীনস্থ দাসের সাথে বিয়ে দিতে মোটেই সংকোচবোধ করেননি। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত দু'চারটি নয়, শত শত পাওয়া যাবে, যা অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের আমলে রাজতন্ত্র পরিপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিলো, জেঁকে বসেছিলো। রাজ পরিবারের দেড়শ' বছরের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন উলামা ও সত্যনিষ্ঠ মুসলিম জনগণের নিকট নিন্দিতই হয়েছিলো। যথার্থ হকপন্থী কোনো আলেম সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখাকে এক প্রকার গুনাহ মনে করতেন। নিজস্ব পরিমন্ডলে তারা ইসলামের বৈপ্লবিক কার্যধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কহীনতা বজায় রেখে তাদের বিরুদ্ধে জনমনে সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন ক্রোধ ও ঘৃণা। এ ঘৃণা ছিলো তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ছিলেন এমনই একজন হক পরস্ত আলেম ও ফকীহ। তিনি সুলতান ও আমীর উমরাহদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে নিষেধ করতেন। তাঁর মতে, রাজ দরবার ও শাহী মহলে ঘোরাফেরা করা উলামায়ে কেরামের মর্যাদার বিরোধী। এর ফলে দ্বীন সুলতান ও প্রশাসকদের ক্রীড়ণকে পরিণত হয় এবং একপর্যায়ে দ্বীনকে বিক্রি করে দেয়ার প্রশ্ন দেখা দেয়। এ জন্য তিনি দুনিয়া-পরস্ত উলামায়ে কেরামের কঠোর সমালোচনা করতেন। একদিন তিনি খবর পেলেন, তার বিশেষ বন্ধু ও সাথী ইবনে উলইয়া উমরাহ ও সুলতানের দরবারে হাজিরা দিতে শুরু করেছেন। তাকে সাদকা কালেকশানের ইনচার্জ পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ইবনে উলইয়া ছিলেন সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এ খবর শুনে বড়ই মর্মপীড়া অনুভব করলেন। বেশ কিছু দিন পর ইবনে উলইয়া তার দরবারে হাযির হলেন কিন্তু তিনি তার সাথে কথা বললেন না। ইবনে উলইয়া অত্যন্ত পেরেশান হয়ে ফিরে গেলেন।

গভীর দুঃখে ও মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়ে তিনি ইবনে মুবারকের কাছে পত্র লিখলেন, জানি না আপনি কেন আমার প্রতি নারাজ হলেন।

আবদুল্লাহ জবাবে লিখলেন, "আপনি ইল্‌মকে এমন এক বাজপাখী বানিয়েছেন যা গরীবদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আপনি দুনিয়া ও তার আয়েশ-আরামের জন্য দ্বীনকে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থায় সহযোগিতা করছেন। সেই হাদীসগুলো কোথায় গেলো, যাতে সুলতানদের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে? আপনি বলবেন, আমি অক্ষম। আমি বলবো, কিতাবের বোঝার ভারে নুইয়ে পড়া একটি পালংকের দুরবস্থা এমনিই হয়।"

ইবনে উলইয়া এ জবাব পড়ে চিৎকার করে উঠলেন এবং তখনই ইস্তফানামা লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

খিলাফতে রাশেদের আমলের পরে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের যুগে এভাবে হকপরস্ত উলামায়ে কেরাম রাজকীয় মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি ঘৃণার চাবুক সর্বক্ষণ উদ্যত রেখে জনগণের মধ্যে রাজতান্ত্রিক জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আক্রোশ জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইনসাফ ইসলামী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য

ন্যায় বিচার কেবল একটি মানবিক গুণ নয়, একটি মানবিক অধিকার। আধুনিক সমাজের এটি একটি পূর্বশর্ত। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিক থেকেই ইসলাম এই ন্যায় বিচারকে সুনিশ্চিত করেছে। প্রাচীনকালে আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান (আঃ) বাদশাহ নওশের ওঁয়া ইত্যাদির ন্যায় বিচারের কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। এগুলো ব্যতিক্রমী মানবিক কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অসংখ্য অন্যায়, অবিচার এবং রাজা-বাদশাহদের জুলুম-অত্যাচারের মধ্যে এগুলো ন্যায় বিচারের কতিপয় দৃষ্টান্ত।

কিন্তু ইসলামী সমাজের ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যায় বিচারের ওপর। কুরআনের অসংখ্য জায়গায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রাঃ) আমলে ঈসায়ী সপ্তম শতকে ন্যায় বিচারের জন্য প্রথম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কাযী শুরাইহ ছিলেন সে আদালতের প্রধান বিচারপতি।

তখন ছিলো চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রাঃ) শাসনামল। রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয়েছিলো। কাযী শুরাইহের আদালত ছিলো সেখানে। আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ) ও একজন ইহুদীর মামলা তার আদালতে পেশ করা হলো। আমীরুল মুমিনীনের লৌহবর্ম কোথাও পড়ে গিয়েছিলো। জনৈক ইহুদী তা উঠিয়ে নিয়েছিলো। আমীরুল মুমিনীন আদালতের দ্বারস্থ হলেন। প্রধান বিচারপতি কাযী শুরাইহ উভয়ের বক্তব্য শুনলেন। ইহুদী বললো, এ বর্ম আমার এবং এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এটা আমার কাছে এবং আমার কবজায় আছে। বিচারপতি আমীরুল মুমিনীনকে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে বললেন। তিনি হাসান (রাঃ) ও কাম্বর (রাঃ) দু'জনকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন। বিচারপতি বললেন, কাম্বরের সাক্ষ্য তো গ্রহণযোগ্য কিন্তু হাসানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আমীরুল মুমিনীন বললেন, আপনি হাসানের সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন না। আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তি শুনেননিঃ হাসান ও হোসাইন হবে জান্নাতী যুবকদের নেতা? প্রধান বিচারপতি

শুরাইহ বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি, কিন্তু আমার মতে পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কাজেই দ্বিতীয় সাক্ষী না থাকার কারণে আমীরুল মুমিনীনের দাবী নাকচ করে দেয়া হলো। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন কোনো অর্ডিন্যান্স জারি করে বা কৌশলের আশ্রয় নেবার চেষ্টাও করলেন না। বরং তিনি কাযীর ফায়সালা মেনে নিলেন।

ইহুদীর উপর আদালতের এই কার্যক্রম এবং তার মোকাবিলায় আমীরুল মুমিনীনের ভূমিকা বিরাট প্রভাব বিস্তার করলো। সে দেখছিলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও এক ব্যক্তি তার বর্ম ছিনিয়ে নিচ্ছে না। বরং আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে। বাদী হিসেবে তার সামনে আসছে। আদালত তার সাথে কোনো পৃথক ও রাজযোগ্য ব্যবহারও করছে না। বাদী ও বিবাদী উভয়েই সেখানে সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করছে। আদালতের কার্যক্রমও স্বাভাবিক। প্রতিদিনকার মতো। আমীরুল মুমিনীনের মোকদ্দমার কারণে এ মোকদ্দমাটিকে কোনো বিশেষ গুরুত্বও দেয়া হয়নি। আদালতের বিচারপতি আমীরের ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন এবং আমীর তা নতমস্তকে মেনে নিলেন। ইসলামী আদালতের স্বার্থহীন নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার এবং আমীরুল মুমিনীনের ন্যায়নিষ্ঠ কার্যক্রম তার হৃদয় স্পর্শ করলো। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই সে চিৎকার করে উঠলোঃ এ লৌহবর্ম যথার্থই আমীরুল মুমিনীনের। যে দ্বীনের কাযী তার আমীরের বিরুদ্ধে ফায়সালা দিতে পারেন। এবং আমীর তা নীরবে মেনে নেন, সে দ্বীন সত্য ও সঠিক এতে কোনো সন্দেহ নেই। আজ থেকে আমি সেই দ্বীনের অনুসারী হলাম। এ কথা বলেই সে কালেমা শাহাদত পড়লোঃ আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু। ইহুদীর ইসলাম গ্রহণে আমীরুল মুমিনীন এতোই খুশি হলেন যে, বর্মটি তাকেই দিয়ে দিলেন।

কাযী শুরাইহের আদালতের আর একটি ঘটনা। আদালতের এজলাস চলছিলো। এমন সময় সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম আশআছ ইবনে কায়েস আদালতে এলেন। কাযী শুরাইহ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আমাদের শাইখ ও সরদারের আগমন শুভ হোক। তারপর তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি প্রবেশ

করলো। তার চেহারা-সুরাত, লেবাস-পোশাক থেকে বুঝা যাচ্ছিল, সে একজন অতি সাধারণ লোক। সে আশআছের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো এবং আদালতের কাছে ইনসাফ চাইলো। বিচারপতি শুরাইহ তার আর্জি শুনলেন। তার বক্তব্য শেষ হবার সাথে সাথেই শুরাইহের দৃষ্টি বদলে গেলো। তিনি আশআছকে সম্বোধন করে বললেন।

"আশআছ এখান থেকে ওঠো, বিবাদীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াও এবং বাদীর অভিযোগের জওয়াব দাও।"

আশআছ বিচারপতি শুরাইহের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠলেন এবং বললেন, আমি এখানে বসেই তার নালিশের জবাব দিচ্ছি।

বিচারপতি শুরাইহের কঠোর নির্দেশ বাতাসে অনুরণিত হলো ঃ "না এখনই ওঠো, নয়তো আমি কাউকে হুকুম দেবো, তোমাকে এসে উঠিয়ে দেবে।"

আদালতে পিন পতন নীরবতা। আশআছ চুপচাপ উঠলেন এবং আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

এ ছিল ইসলামের বিচারপতি ও বিচারালয়। আদালতের কাঠগড়ায় রাজা-বাদশা-ফকির-গরীবের কোনো পার্থক্য নেই। ইনসাফ সবার জন্য সমান।

একবার কাযী শুরাইহের ছেলের বিরোধ বাধলো কয়েকজন লোকের সাথে। ছেলে পিতাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করলো, এখন বলুন আমি এই লোকদের বিরুদ্ধে আপনার আদালতে নালিশ করলে কি আমার পাওনা পেতে পারবো? আমার পাওনা লাভের আশা থাকলে নালিশ করবো, নয়তো নীরব থাকবো।

শুরাইহ তাকে মোকদ্দমা দায়ের করার পরামর্শ দিলেন। মোকদ্দমা তাঁর সামনে পেশ হলো এবং তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে ফায়সালা দিলেন। গৃহে ফিরে আসার পর পুত্র বললো, আপনার সাথে পরামর্শ না করলেই বরং ভালো ছিল। তাহলে এ ধরনের ফায়সালায় আমার কোনো অভিযোগ থাকতো না। কিন্তু আপনি নিজেই আমাকে মোকদ্দমা দায়ের করার পরামর্শ দিলেন আবার নিজেই তার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। এভাবে আমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করলেন।

পুত্রের অভিযোগের জবাবে শুরাইহ যা বললেন কেবল ইনসাফের ইতিহাসে তা সোনার হরফে লিখে রাখার যোগ্যতাই নয় বরং তা ইসলামী নেজামের ইনসাফ প্রিয়তারও একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, শুরাইহ বললেন ঃ

প্রিয় পুত্র! পৃথিবীতে তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়, কিন্তু আল্লাহ তোমার চেয়েও প্রিয়। তোমার মোকদ্দমায় অন্য লোকদের যথাযথ পাওনা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। যদি তা তোমাকে জানিয়ে দিতাম তাহলে তুমি তাদের সাথে আপোস করে নিতে। ফলে তারা তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হতো। তাই তোমাকে মোকদ্দমা দায়ের করতে বলেছিলাম।"

কাযী শুরাইহ লোকদের উপহার গ্রহণ করতেন। কিন্তু কাযী হিসেবে উপহার গ্রহণ করার ফলে যদি উপহারদাতা তার মাধ্যমে কোনো রকম অন্যায়ভাবে লাভবান হতে চায় তাই সাথে সাথেই তাকে জবাবী উপহারও প্রদান করতেন।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে তিনি কাযী নিযুক্ত হন এবং উমাইয়া বাদশাহ আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমল পর্যন্ত একাধারে ষাট বছর এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তখন হযরত উমরের খিলাফত আমল ছিল। খলিফা একটি ঘোড়া কিনেছিলেন এই শর্তে যে, পছন্দ হলে নেবেন, নয়তো ফেরত দেবেন। ঘোড়াটির দ্রুততা পরীক্ষা করার জন্য সেটি একজন ঘোড়সওয়ারকে দিলেন। ছুটে আসার পথে একটি পাথরে পা খোঁড়া হয়ে গেলো। খলিফা ঘোড়া ফেরত দিলেন। কিন্তু বিক্রেতা ফেরত নিতে অস্বীকার করলো। দু'জন মিলে ফকীহ শুরাইহকে শালিস মানলেন। শুরাইহ ফায়সালা দিলেন যে ব্যক্তি ঘোড়া ক্রয় করেছেন তাকে অবশ্যই তা রেখে দিতে হবে অন্যথায় ঘোড়া যে অবস্থায় নিয়েছিলেন সে অবস্থায় ফেরত দিতে হবে। উমর কেবল ফায়সালাই গ্রহণ করলেন না বরং শুরাইহকে কুফার কাযী নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, এই ধরনের সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, সাহসী, স্পষ্টবক্তা, ফকীহ ও মুহাদ্দিসই কাযী হবার যোগ্য।

বাদশাহ মামুনের দর্প চূর্ণ করলেন শাইখ আবদুল আযীয

ইসলাম একটা জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত করেছে এবং তার উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। মুসলমানদের জ্ঞান চর্চা এই ধারায় এগিয়ে চলে। ইতিপূর্বে জ্ঞানের একটা প্রাচীন ধারা গ্রীসে প্রবাহিত ছিল। ইসলামের আগমনকালে এর স্রোত বিশীর্ণ ও বিশুষ্ক হয়ে হারিয়ে যেতে বসেছিল। মুসলমানরা তাকে সঞ্জীবিত করে এবং তাতে নতুন করে প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করে। এ ধারায় যুক্তিবাদই ছিল প্রবল। কুরআনের অহীর সাথে মুসলমানরা সংযুক্ত করে যুক্তিবাদ। ফলে বিশ্বাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘাত দেখা দেয়।

মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ই'তিযাল- সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া। জন্ম নেয় মু'তাযিলা মতবাদ। যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করা এবং যুক্তির বাইরে কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করা। হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে আব্বাসীয় বাদশাহ মামুনর রশীদের শাসনামলে এ মতবাদ রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বাদশাহ নিজেই এ মতবাদ গ্রহণ করে এর প্রবল প্রচারকে পরিণত হন। রাষ্ট্রের প্রায় সকল প্রধান ও নীতি নির্ধারণী পদে মু'তাযিলীদের নিযুক্ত করেন।

এ সময় মুতাযিলীরা "খাল্কে কুরআন" এর ফিত্না সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, কুরআনও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। মুতাযিলীদের এ চিন্তা ইসলামী বিধানের মূল প্রাণশক্তিতে আঘাত হানে। অর্থাৎ কুরআনের ধ্বংসশীলতা যদি প্রমাণিত তাহলে কুরআনী বিধানের অভ্রান্তি ও চিরন্তনতা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। কুরআনের বিধান যে অপরিবর্তনীয় একথার আভ্যন্তরীন শক্তিতে চিড় ধরে।

মুতাযিলীদের এ মতবাদ সমগ্র ইসলামী বিশ্বের চিন্তাজগতে এক বিরাট বিশৃংখলার জন্ম দেয়। এই সংগে বাদশাহ মামুন তাঁর শাসনযন্ত্রকে কেবল এই মতবাদ প্রচারে ব্যবহার করে ক্ষান্ত হননি বরং এই সংগে মুসলিম আলেম ও পন্ডিতদের থেকে এর প্রতি সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায় করার এবং এ মতবাদ অস্বীকারকারীর জন্য প্রাণদন্ড অথবা কারাবাসের ফরমান জারি করেন।

ফলে অতি শীঘ্রই এটি আলেম ও বুদ্ধিজীবী শ্রেনীকে ফিত্‌নার মধ্যে নিক্ষেপ করে। বহুল পরিচিত ও খ্যাতিমান আলেমগণ এ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার এবং রাজরোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ ও আত্মগোপন করতে থাকেন। বাগদাদে ও অন্যান্য শহরে বহু হকপরস্ত আলেমের প্রাণদন্ড হয় এবং অসংখ্য আলেম কারাবরণ করেন।

শাইখ আবদুল আযীয কিনানী (মৃত্যু ২৪০ হিঃ) এ সময় মক্কা মুআয্‌যমায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার ছাত্র এবং ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী ও বন্ধু। দীর্ঘকাল ইমাম শাফেয়ীর সাথে অবস্থান করেছিলেন। তিনি এ খবর শুনলেন। তিনি শুনলেন জুলুম ও নিপীড়নের সামনে সত্যের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সত্যের বাণী উচ্চারণ করার কেউ নেই। সত্য মজলুম ও দলিত মথিত। মিথ্যা বিজয়ী ও ক্ষমতার দর্পে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

শাইখ আবদুল আযীয মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। বাগদাদে এসে বাদশাহ মামুন ও মুতাযিলীদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন। মামুন হেসে উঠলেন। শাইখের বংশপরিচয় ও ইল্‌মী যোগ্যতা জানতে চাইলেন। মানে হাতী ঘোড়া যে জলাশয়ে তল পায়নি সেখানে কোথাকার কোন নাম গোত্রহীন বৃদ্ধ আবার এসেছে সাঁতার কাটতে।

শাইখ উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "আমি একজন গরীব ইল্‌ম আহরণকারী। বসবাস কাবাঘরের আঙিনায়। আমার চেহারা সুরাতও সুন্দর নয়। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাঁর কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন। আমি শুনেছি হক মজলুম হয়ে গেছে। সুন্নাতের রোশনী নির্বাপিত হয়েছে। বিদাতের শক্তি বেড়ে গেছে। যে কথার অংগীকার আল্লাহ নেননি মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে, আল্লাহর রাসূলও যার সাক্ষ্য দিননি, খোলাফায়ে রাশেদীনও যার ঘোষণা দেননি এবং রাসূলের কোনো সাহাবীও। আজ এমন এক ব্যক্তি তাকে ঈমানের শর্ত বলে দাবী করছে যার জন্ম হয়েছে হারুনর রশীদের গৃহে। সে তাবেঈদেরকে দেখেনি এবং রসূলের কোনো সাহাবীকেও। সে নবুওয়াত যুগের বরকত লাভে ধন্য হয়নি। এ সত্ত্বেও সে নাকি শরীয়তে ইলাহীর গোপন রহস্য জানে, যা জানতেন না সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈরা। অথচ তারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন মুমিন হিসেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ ব্যাপারে কিছু

বলেননি। অথচ তাঁর প্রতি অহী নাযিল হয়েছে এবং তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করেছেন। ......আমীরুল মুমিনীন, আপনি বাতাসের এমন একটা ঝট্কা যা শরীয়তের আলো জ্বালাতে সাহায্য করেনি ঠিকই কিন্তু সুন্নাতের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে।.......হে হারুনের পুত্র! এখন আপনি কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলভিষিক্তেরই নয় বরং খোদ নবুওয়াতেরই দাবীদার সেজেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অংগীকার নেননি আপনি জুলুম-নিপীড়নের সর্ববিধ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তার অংগীকার নিচ্ছেন। আপনার মতে কোনো ব্যক্তি মুসলমানই হতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাবকে সৃষ্টি বলে স্বীকার করবে .... হে মামুন! আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত হও, যাতে ঢিল দেয়া হয় ঠিকই কিন্তু যার হাত থেকে বাঁচোয়া নেই।"

বাদশাহ মামুন চুপচাপ বসে শায়খের বক্তব্য শুনে গেলেন। তার যেন করার কিছুই ছিল না। সকল শক্তিই রহিত হয়ে গিয়েছিল।

মুনাযিরা শুরু হলো। দীর্ঘক্ষণ সওয়াল ও জওয়াব চলতে থাকলো। সবশেষে মুতাযিলীদের নেতা বাশার মরিসী এক প্রশ্ন করলেন ঃ

কুরআনে অসংখ্য জায়গায় আল্লাহকে "খালেকু কুল্লি শাইয়িন" (সকল জিনিসের স্রষ্টা) বলা হয়েছে কি না?

হ্যাঁ, তিনিই সকল জিনিসের স্রষ্টা। কুরআনও "শাই" (জিনিস) কিনা? বাশার জিজ্ঞেস করলেন।

প্রথমে "শাই"-এর স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিরূপন করা হোক, জবাবে শায়খ বললেন।

আমি আর কিছুই শুনতে চাই না। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। বাশার চীৎকার দিয়ে বললেন।

মামুনও সক্রোধে ফেটে পড়লেন ঃ আবদুল আযীয, জবাব দিচ্ছেন না কেন?

শাইখ ইতস্তত করছিলেন। হাঁবাচক জবাব দিলে তো প্রতিপক্ষ খুশিতে লাফিয়ে উঠবে এবং কুরআনকে ধ্বংসশীল বলবে। কারণ প্রত্যেক জিনিসই ধ্বংসশীল। শায়খ চিন্তার গভীরে ডুবে গেলেন। হঠাৎ তিনি যেন নতুন সূত্রের সন্ধান পেলেন। জোর গলায় বলে ওঠলেন ঃ

হাঁ, আমি স্বীকার করছি, কুরআনও "শাই"

তাহলে কুরআনও সৃষ্টি, মামুন ও বাশার দু'জনই লাফিয়ে উঠলেন।

না, এ থেকে এ কথা প্রমাণ হয় না, শায়খ বুলন্দ আওয়াজে বললেন। কুরআন বলে : "ওয়া ইউহায্যিরুকুমুল্লাহ নাফসাহু"। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নফ্স সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছেন। এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহরও নাফ্স আছে। অন্যদিকে কুরআন বলছে, "কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাউত"। অর্থাৎ প্রত্যেক নাফস মৃত্যুবরণ করবে। কাজেই যদি কুরআন শাই-এর মধ্যে প্রবেশ করে মাখলুক বা সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহও নাফ্স-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন- নাউযুবিল্লাহ। এটা কি সম্ভব?

এখন মামুন ও মুতাযিলীদের অবস্থা ফাবুহিতাল্লাযী কাফার" অস্বীকারকারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো-এর মতো। বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন মুতাযিলীরা। শাইখ বিজয়ীর বেশে দরবার থেকে বের হয়ে এলেন সমগ্র নগরবাসী তাঁকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য এগিয়ে এলো।

সুলতানের শরীয়ত বিরোধী পদক্ষেপকে রুখে দিলেন ইমাম নববী

হিজরী সপ্তম শতকের শেষার্ধের কথা। সুলতান যাহের রুকনুদ্দিন বাইবারাস তখন দামেসকের শাসনকর্তা। বিশ্বের মুসলিম শাসনের পতনের সূচনা হয়েছে। কিন্তু সেটা নিরবচ্ছিন্ন পতন নয়। এটা আসে আরো কয়েক শতক পরে। এখন চলছিল পতন ও উত্থান। ক্রুসেডারদের শক্তির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী। তবুও তারা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিশেষ করে সিরিয়া ও ফিলিস্তানের কোনো উপকূলীয় খৃষ্টীয় উপনিবেশ থেকে। এখনো এসব এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব চলছিল। সুযোগ পেলেই তারা আক্রমণ করতো মুসলমানদের ওপর।

কিন্তু মুসলমানদের জন্য তখন সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করেছিল তাতারীরা। সাইবেরিয়া থেকে শুরু করে এশিয়ার সমগ্র উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভূখন্ডে তারা একের পর এক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো বিধ্বস্ত ও পদানত করে আসছিল। তারা হয়ে ওঠেছিল অজেয়। মুসলিম জনসাধারণ

ও শাসকরা তাদের ভয়ে কাঁপছিল। তাদের প্রবল আক্রমণে আব্বাসীয় শাসনের পতন সূচিত হয়েছিল। রূপকথার নগরী বাগদাদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা বন্যার স্রোতের মতো এগিয়ে চলছিল সিরিয়া ও মিসরের দিকে। কিন্তু সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবারাস তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন চীনের প্রাচীরের মতো। তুমুল যুদ্ধের পর আইনুল জালুত নামক স্থানে তাতারীরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। এ হলো তাদের প্রথম পরাজয়। সুলতান রুকনুদ্দীন স্রোতের মুখ ফিরিয়ে দিলেন। এখন এ বন্যা প্রতিরোধের সকল দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হলো। তার রাজ্যও খুব বেশী বিস্তৃত ছিল না। সৈন্যবল ও অর্থবলেও তিনি তেমন বলশালী ছিলেন না।

তাই তাতারীদের পরবর্তী আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তিনি সৈন্য সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু এ জন্য বিপুল অর্থ প্রয়োজন। জনগণের কাছ থেকে এ অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই।

তিনি আলেমদের কাছে ফতোয়া চাইলেন। প্রজা সাধারণের ওপর ট্যাক্স লাগিয়ে তিনি সমরসজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবেন। আর এ সমরসজ্জা এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যারা মুসলমানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সিরিয়ার সকল আলেম ও ফকীহ তাদের মতামত সহকারে ফতোয়া লিখে পাঠাচ্ছেন। সুলতান জিজ্ঞেস করেন, সকল আলেম ফতোয়া দিয়েছেন? কেউ বাদ পড়েননি তো? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, একজন এখনো দেননি। তিনি শাইখ মুহীয়্যুদ্দীন নববী (রঃ)। সুলতান তাঁকে ডেকে পাঠালেন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখনো ফতোয়া দেননি? সবার মতো আপনিও ফতোয়া দিয়ে দিন। কিন্তু শাইখ ফতোয়া দিতে অস্বীকার করলেন। সুলতান কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাব দিলেন, আমি জানি আপনি ছিলেন আমীর বন্দেকেদারের ক্রীতদাস। তারপর আল্লাহ আপনার প্রতি মেহেরবানী করেছেন। আপনাকে আমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আপনার অধীনে এখন এক হাজার গোলাম আছে। তাদের সমস্ত আসবাবপত্র স্বর্ণ নির্মিত। তাছাড়া আপনার মহলে দুশ' বাদী আছে। সোনা-রূপার অলংকারে তাদের সারা অংগ ভরে আছে। যতক্ষণ না আপনি এইসব মহামূল্যবান জিনিসগুলো আপনার

গোলাম ও বাদীদের থেকে নিয়ে জিহাদ ফান্ডে জমা করছেন ততক্ষণ আমি গরীব মুসলমানদের থেকে অর্থ গ্রহণ করার ফতোয়া দিতে পারি না।

সত্যের স্বাদ সব সময়ই তিতা হয়। আর শাসনকর্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা বরদাশত করতে পারেন না। সুলতান শাইখের এই সত্য কথনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলেন। হুকুম দিলেন, আমার শহর দামেশক থেকে বের হয়ে যান। শাইখ জবাব দিলেন অবশ্যই বেরিয়ে যাবো। আল্লাহর দুনিয়া অনেক প্রশস্ত আর আমাকেও আল্লাহ চলার ক্ষমতা দিয়েছেন।

ফলে শাইখ দামেশক ত্যাগ করে তার পিতৃপুরুষের আবাস নিজের জন্মস্থানের পথে রওয়ানা হলেন।

শাইখের নগর ত্যাগের কথা মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়লো। সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, আলেম, উলামা সবাই পেরেশান হয়ে গেলেন। আলেম, ফকীহ ও সুলতানের সভাসদগণ একত্র হয়ে সুলতানের কাছে আরজ করলেন হে সুলতান! শাইখ নববী তো ছিলেন এই শহরের দ্বীনী জীবনের প্রাণ-প্রবাহ এবং এর মহান মর্যাদা। তিনি ছিলেন একাধারে দামেশকের আলেম, ফকীহ এবং মুসলমানদের ইমাম ও মুরশিদ। তাঁকে ছাড়া এ শহরের ইসলামী জীবনধারাই অপূর্ণ। কাজেই তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন।

সবার অনুরোধে সুলতান তার হুকুম প্রত্যাহার করলেন। শাইখকে দামেশকে ফিরে আসার ও বসবাস করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইলম ও আমলের সাম্রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে দিলেন "যতক্ষণ সুলতান দামেশকে আছেন আমি ওখানে যেতে পারি না।"

এ ঘটনার পর মাত্র এক মাসও অতিক্রম করেনি সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবারাস ইন্তেকাল করলেন। তারপর শাইখ মুহীয়্যুদ্দীন নববী দামেশকে ফিরে এলেন।

এ শাইখ নববী কে ছিলেন? দুর্জয় তাতারী শক্তিকে বিধ্বস্ত করার মাধ্যমে যে সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবারাস মুসলিম জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন তার সামনে সত্যের বাণী উচ্চারণ করে এবং তার একটি অবৈধ ও শরীয়ত বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দুঃসাহস দেখিয়ে যিনি তাঁর ক্রোধের মোকাবিলা

করেছিলেন তিনি ছিলেন হাদীসের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সহী মুসলিমের ব্যাখ্যাতা বিখ্যাত হাদীস সংকলন রিয়াদুস সালেহীন প্রণেতা ইমাম নববী। তিনি ছিলেন সমকালীন ফিকহের ইমাম, হাদীসের হাফেজ ও শাইখুল ইসলাম। ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সমকালে তাঁর নজির ছিল না। তাঁর আসল নাম ছিল ইয়াহইয়া, উপনাম ছিল আবু যাকারীয়া এবং উপাধি ছিল মুহীয়্যুদ্দীন। জন্ম ৬৩১ হিজরী এবং মৃত্যু ৬৭৬ হিজরীতে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনের শেষের উনিশ বছরে ১৮টি বিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর অনেকগুলোই বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী। কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, রিজাল ও শব্দতত্ত্বের ওপর তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যে বিষয়ে তিনি কলম চালিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে জ্ঞানের মহাসমুদ্র মনে হবে।

এর আগে আর একবার শাইখ নববী সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবারাসের মোকাবিলা করেছিলেন। সুলতান একবার দামেশ্কের অধিবাসীদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জব্দ করার হুকুম জারি করলেন। জানিয়ে দিলেন, বিষয়-সম্পত্তির বৈধ দলিল প্রমাণ দেখিয়ে প্রত্যেককে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতে হবে। যারা প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, তাদের সম্পদ-সম্পত্তি সরকারের অর্থভান্ডারে জমা হয়ে যাবে।

শাইখ মুহিয়্যুদ্দীন নববীই এই অন্যায় ফরমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। সারা শহরে এ হুকুমের ফলে মহা আতংকের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। জনগণের আতংক ও তার কারণ উল্লেখ করে শাইখ সুলতানের কাছে একটি পত্র লিখলেন। তাকে তিনি জানালেন ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনার নাম। আর এ কল্যাণ কামনা হচ্ছে আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিম জনগণের জন্য। এই হাদীসের তাগিদেই আমরা আপনার ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আপনাকে সতর্ক করা জরুরী মনে করছি। মহান আল্লাহ শাসকদের প্রতি ফরয করে দিয়েছেন যে, তাঁরা প্রজাদের সাথে কোমল ব্যবহার করবেন, তাদেরকে ভালোবাসবেন, দুর্বলদের সাহায্য করবেন এবং বিপদ-আপদে তাদেরকে সহায়তা দান করবেন। আল্লাহ বলেছেন, ওয়াখ্ফিদ জানাহাকা লিল মুমিনীন- "মুমিনদের সাথে কোমল ব্যবহার করো।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুর্বল ও কমজোরদের কারণে তোমাদের সাহায্য ও রিযিক প্রদান করা হয়।" তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোনো বিষয় সোপর্দ করা হয় এবং সে তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করে হে আল্লাহ তুমিও তার সাথে কোমল ব্যবহার করো। আর যদি সে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করে তাহলে তুমিও তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করো।"

আল্লাহ আপনাকে হুকুমত দান করে আমাদের তথা মুসলমানদের প্রতি বিরাট মেহেরবানী করেছেন। আপনার মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের সাহায্য-সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। সামান্য সময়ের মধ্যে আল্লাহ আপনাকে বিরাট বিজয় দান করেছেন। মুসলমানদের শত্রুদেরকে পরাজিত লাঞ্ছিত ও দুর্বল করে দিয়েছেন। এ সবই তাঁর মেহেরবানী। এজন্য আল্লাহর যতই শোকরগুজারী করা যাবে ততই তিনি তাঁর মেহেরবানী বাড়িয়ে দিবেন ঃ লাইন শাকারতুম লাআযীদান্নাকুম।

কিন্তু মুসলমানদের সম্পত্তির মালিকানার যে দলিল প্রমাণ পেশ করার ফরমান আপনি জারি করেছেন এর ফলে মুসলমানদের যে ক্ষতি হচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়। কোনো একজন আলেমও আপনার এই দাবীকে যথার্থ মনে করেন না। কারণ সকল আলেম ও ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে, সম্পত্তির ওপর দখলদারীত্বই সম্পত্তির মালিকানার প্রমাণ। অর্থাৎ যে ব্যক্তির দখলে যে সম্পদ বা সম্পত্তি আছে তাকেই তার মালিক বিবেচনা করা হবে। বিনা কারণে তার কাছে তার মালিকানার প্রমাণ চাওয়া যাবে না। আপনার ব্যাপারে জনগণের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, আপনি শরিয়তের বিধান মেনে চলেন। কাজেই আপনার এই শরীয়ত বিরোধী হুকুমটি প্রত্যাহার করে নিন এবং এই হুকুমের ফলে সাধারণ প্রজাবৃন্দ যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। এই বিপদগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছে ইয়াতিম, মিসকিন, কমজোর ও দুর্বল মুসলমানরা এবং আল্লাহর এমন সব নেককার ও দুর্বল বান্দারা যাদের বদৌলতে আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও রিযিক বিস্তৃত করেন।

এই ফরমানের দ্বারা তারাই বেশী প্রভাবিত হয়েছে যারা মীরাসের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিক হয়েছে। আর সাম্প্রতিককালের তাতারি আক্রমণের টানাপোড়ানে স্থানান্তর ও অন্যান্য কারণে এইসব উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কাগজপত্র ও দলীল দস্তাবেজ ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের দশা এখন বড়ই করুণ। যদি আপনি তাদের প্রতি মেহেরবানী করেন তাহলে আল্লাহও আপনার প্রতি মেহেরবানী করবেন এবং আপনি আল্লাহ ও রাসূলের দোয়ার ক্ষেত্রে পরিণত হবেন। তাছাড়া মুসলমানরা ও আপনার জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ চাইলে আপনার এই নেক কাজের বরকত সমগ্র দেশের ওপর প্রকাশিত হবে।

এ ছিলেন ইমাম মুহীয়্যাদ্দীন নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সত্য ও ন্যায়ের প্রকাশে এবং আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত। তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং ইল্‌ম ও আমলকে নিয়ে গৃহকোণে বসে যাননি। বরং অন্যায়কে মাথাচাড়া দিতে দেখেই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাকে আঘাত করেছেন। সে আঘাত প্রশাসনের বাইরে বা ভিতরে, সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ যে স্তরেই লাগুক না কেন তার কোনো পরোয়াই তিনি করেননি। তার যে কোনো প্রত্যাঘাত মাথা পেতে নেবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন সব সময়।

ইবনুল জওযী নসিহতের মাধ্যমে বাদশাহর সংশোধন করলেন

দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন আল্লামা আবদুর রহমান ইবনুল জওযী। জন্ম ৫১০ হিজরী সনে এবং মৃত্যুও হয় একই শতকে ৫৯৭ সনে। একটি শতকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বিচরণ করেন ইলমী জগতে মহাপ্রতাপের সঙ্গে।

তার কথা মতে এক হাজারের মতো গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। আবার এর মধ্যে কোনো কোনোটি ছিলো বিশালাকৃতির। স্মৃতিশক্তি ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। একবার শুনলেই পাথরের গায় লোহা দিয়ে খোদাই করার মতো গভীর দাগ কেটে বসতো। কথার প্রভাব এমন ছিলো যে, পাথরও গলে মোম হয়ে যেতো। তার কথায় মানুষ দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতো এবং

আখেরাতমুখি হয়ে যেতো। তার মুখ নিঃসৃত প্রতিটি বাক্য ও শব্দ ছিলো ইসলামের সত্যতার প্রমাণ ও প্রকাশ। ইসলামের চরম বৈরীও তার কথায় বন্ধুভাবাপন্ন হতো এবং গাফেল হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠতো। তিনি নিজেই বলেন, আমার ওয়াজ-নসিহতে এক লক্ষ জন মুসলমান আমার হাতে তওবা করেছে এবং বিশ হাজার ইহুদী ও খৃষ্টান ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

যুগের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ আলেম। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, রিজাল, ভূগোল, চিকিৎসা বিদ্যা, কাব্য ও কবিতা ইত্যাদি যুগের প্রত্যেকটি শাস্ত্রে ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী।

তাঁর মজলিসে পনের বিশ হাজারের উপস্থিতি তো ছিলো সাধারণ ব্যাপার। অনেক সময় লক্ষাধিক জনসমাগমও হয়ে যেতো। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেরা দলে দলে ছুটে আসতো। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে সমাজের বিশিষ্ট শ্রেণী, আমীর-উমরাহ ও শাহী পরিবারের লোকেরাও তাঁর মজলিসে অতি আগ্রহের সাথে হাজির হতো। তিনি নির্ভীক চিত্তে যথার্থ সত্য কথাটিই সবার সামনে তুলে ধরতেন। কারোর পরোয়া করতেন না। সত্য প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না।

বাগদাদের বাদশাহ আলমুসতাদা বিল্লাহর দূত ইবনুল জওযীর কাছে এলো তার পয়গাম নিয়ে। বাদশাহ তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন তার দরবারে এসে ওয়াজ-নসিহত করার জন্য। বৃহস্পতিবার ইবনুল জওযী তাঁর মাদ্রাসা থেকে বের হলেন প্রতিদিনকার মতো সাধারণ পোশাক পরিধান করে। রাজমহলে পৌঁছলেন। বাদশাহ নিজেই এগিয়ে এলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

ইবনুল জওযী তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন হারুনর রশীদ একবার তার সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেম শাইবানকে বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করুন। শাইবান বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি অবশ্যই নসিহত করবো। আমিরুল মুমিনীন! যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভয় করলো সে যেনো আখেরাতে সংরক্ষিত হয়ে গেলো। আপনি দুনিয়ায় উৎফুল্ল জীবনযাপন করলেন এবং আখেরাতের ব্যাপারে আশংকায় ভুগতে থাকলেন এর চেয়ে ভালো আপনি দুনিয়াকে ভয় করুন।

হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন, যাতে কিয়ামতের দিন ভীতসন্ত্রস্ত হতে না হয় এবং আল্লাহ আপনাকে আপনার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ না করেন। হে আমীরুল মুমিনীন! যদি আপনি চান আপনার সমুদয় পার্থিব কর্মকান্ড কিয়ামতের দিন ন্যায়ের মীযানে পুরোপুরি উতরে যাক, তাহলে কোনো ব্যক্তিকে মিথ্যা বলে খুশী করার চেষ্টা করবেন না। হারুনর রশীদ শাইবানের এই নসিহত শুনে এতো বেশি কাঁদতে থাকলেন যে, তার কান্নায় প্রভাবিত হয়ে সভাসদরাও কাঁদতে থাকলেন।

ইবনুল জওযী বাদশাহ আলমুসতাদকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমিও যদি আপনাকে এ ধরনের নসিহত করি তাহলে আমি আশংকা করি আপনিও কাঁদতে থাকবেন। আর যদি আমি হক কথা না বলি, তাহলে আশংকা হয় হক আপনার কাছে সংশয়মুক্ত হবে না। তাই এ দু'টি বিষয় সামনে রেখেই আমি আপনাকে নসিহত করছি।

হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ সকল প্রকার অভাবমুক্ত। তিনি কোনো প্রকারেই আপনার মুখাপেক্ষী নন। তিনি আপনাকে হাসি, আনন্দ ও দুনিয়ার নিয়ামত দিয়ে ভরে দিয়েছেন। আপনার উচিত আপদমস্তক আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে যাওয়া। তার সামনে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করুন এবং তার সন্তুষ্টিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করুন। আল্লাহ আপনাকে জনগণকে শাসন করার যে নিয়ামত দান করেছেন তার কদর করুন। এ জন্য আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

ইবনুল জওযী কেবল নসিহত করেই ক্ষান্ত হতেন না। বাদশাহর ভুলেরও সমালোচনা করতেন। তবে তার সমালোচনা হতো সংশোধনের সীমানার মধ্যে। একবার বাদশাহ মুসতাদার হিসাবরক্ষক তার হিসাবে জালিয়াতি করলো। বাদশাহ তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করলেন কিন্তু হিসাবরক্ষক অতি সতর্কতার সাথে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হলো। বাদশাহর পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তাকে পাকড়াও করতে অক্ষম হলো। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে তার ভাইকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে যাবতীয় ক্ষতিপূরণ আদায় করার হুকুম দিলেন। বাদশাহর হুকুম তামিল করা হলো। হিসাবরক্ষকের মজলুম ভাই ইবনুল জওযীর স্মরণাপন্ন হলেন।

ইবনুল জওযী একটি নসিহতের মজলিস আহ্বান করলেন এবং সেখানে বাদশাহকেও দাওয়াত দিলেন। মজলুম ব্যক্তিকে বলে দিলেন যে,

মজলিসের শেষ পর্যায়ে সে যেনো তার নালিশ উত্থাপন করে। কাজেই ইবনুল জওযী যখন তার বক্তব্য শেষ করতে উদ্যত হলেন, তখন মজলুম চিৎকার করে তার আবেদন পেশ করলো। ইবনুল জওযীর ওয়াযের ধারা পাল্টে গেলো। তিনি জুলুম-নির্যাতনের নিন্দা করলেন এবং 'ওয়ালা তাযিরু ওয়াযিরাতুন বিযরা উখরা' একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না - এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এই সাথে বললেন, এ ধরনের অন্যায় ও জুলুম থেকে অবশ্যই আমীরুল মুমিনীনকে দূরে থাকতে হবে। এই মজলুমের কাছ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তা অবশ্যই তাকে ফেরত দিতে হবে। বাদশাহ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তার ফরমান রহিত করলেন এবং মজলুমকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন।

হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ইমাম তকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ

হিজরী সপ্তম শতক। ইসলামী বিশ্বে তখন তাতারীদের আক্রমণ জোরেশোরে চলছে। তাতার বাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করছে, এ খবর মিসরে পৌঁছে গেলো। জনতার মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। মনে হচ্ছে যেন এখনি তাতার বাহিনী মিসরে প্রবেশ করে সবকিছু বিধ্বস্ত ও সারাদেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।

সুলতান উলামায়ে কেরামকে আহবান করলেন। পরামর্শে স্থিরীকৃত হলো সহীহ বুখারী খতম করা হবে। সময় নির্ধারিত করে দেয়া হলো। আলেমগণ বুখারী খতম করায় মনোনিবেশ করলেন। খতম প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছিল। শেষাংশটি জুমার দিনের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল। তখনও জুমার দিন তথা শুক্রবার আসেনি। শায়খ তকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ জুমা মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি বুখারী খতম করে ফেলেছেন?

আলেমগণ জবাব দিলেন ঃ " আর এক দিনের মতো পড়া বাকি রয়ে গেছে। আমরা চাচ্ছি জুমার দিন ওটা শেষ করবো।"

শায়খ তকীউদ্দীন বললেন ঃ "মোকদ্দমার ফায়সালা হয়ে গেছে। গতকাল আসরের সময় তাতারী সেনাদল পরাজিত হয়ে পশ্চাদগমন করেছে। মুসলমানরা অমুক সাহাবার অমুক পল্লীর সন্নিকটে বিরাট বিজয় উৎসব করছে।

লোকেরা বললো ঃ আমরা কি এ খবরটা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবো?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ ছড়িয়ে দাও।

কয়েকদিন পরে শাহী ডাক বিভাগের মাধ্যমে এ খবরের সত্যতা যাচাই হয়ে গেলো, একেবারে শায়খ যা বলেছিলেন তার প্রতিটি হরফই ছিল সত্য।

এই শায়খ তকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ ছিলেন হিজরী সপ্তম শতকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দীস। তার জন্ম হয় ৬২৫ হিজরীতে হিজাযের ইয়ামবুতে। হাফেয যাকিউদ্দীন ইবনুল মাযারী, ইবনুল জুমাইযী ও ইবনে আবদুদ ন্যায় সমকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি এমন চল্লিশটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন যার সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত। তিনি সারা রাত জেগে ইল্‌ম চর্চা ও লেখালেখি করতেন।

ইলমে হাদীসে আল ইকতিরাহ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'আল আলমান ফী আহদীমিল আহকাম' নামে যে হাদীস গ্রন্থটি তিনি প্রণয়ন করেন তার মধ্যে এমন সব হাদীস জমা করেন যেগুলোর রাবী হাদীসের ইমামগণ, এই ইমামগণ রাবীগণের পর্যালোচনা করেছেন এবং অনেক হুফ্‌ফাযে হাদীস ও আয়েম্মায়ে ফিক্‌হের দৃষ্টিতে সেগুলোকে সহী প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

হাদীস গবেষণা পর্যালোচনা ও সমালোচনা শাস্ত্রের তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন এ ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে প্রায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মতে সাহাবীগণের জামানার পর থেকে শায়খের জামানা পর্যন্ত হাদীসের 'মতন' তার অর্থও অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে তিনি যে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তা অতুলনীয়। সমকালীন ও পূর্ববর্তীগণের মধ্যে এক্ষেত্রে তিনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'আলমামে'র এক

অংশের ওপর তিনি যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ব্যাখ্যা লিখেছেন মাত্র সেটি অধ্যয়ন করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। বারাআ ইবনে আবেরের একটি হাদীস যেখানে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাতটি কাজের হুকুম করেছেন এবং সাতটি করতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসটি থেকে তিনি চার'শ মাসায়েল ও ফায়দা উদ্ভাবন করেছেন। এগুলোকে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত, ধীরস্থির ও ন্যায়বাদী। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো ঃ আমি নামায পড়তে গেলে বড় বেশি আশংকা ওয়াসওয়াসার সম্মুখীন হই। এ জন্য আমি খুবই মর্মজ্বালা অনুভব করছি। সেই ফকীর দরবেশটি আমাকে বললেন ঃ আফসোস সেই অন্তরের জন্য যার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের চিন্তা প্রবেশ করে। তাঁর এই কথায় আমার অন্তরের রোগ একেবারেই নিরাময় হয়ে গেছে।

একথা শুনে শায়খ ইবনে দাকীকুল ঈদ বললেন ঃ এ মুর্খ অশিক্ষিত ফকীরটি হাজার ফকীহের চাইতে উত্তম।

অনেক আলেম তাঁর একথায় বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁরা বলেন, এটি এই হাদীসের বিরোধী "ফকীহুন ওয়াহেদুম আশাদু আলাশ শায়াতীমে মিন আলফি আবেদিন।" অর্থাৎ একজন ফকীহ শয়তানের ওপর হাজার জন আবেদের চাইতেও শক্তিশালী। কিন্তু সেই আলেমগণ এ কথা ভেবে দেখেননি এবং শায়খের বক্তব্য এভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি যে, এই ফকীর যদিও ফকীহগণের পরিভাষা, নজির ও মাসায়েল জানতেন না কিন্তু তিনি দ্বীনের গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উল্লেখিত হাদীসে এই ধরনের ফকীহ বা তত্ত্ব জ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে। এখানে এমন ফকীহের কথা বলা হয়নি, যিনি ফকীহদের মতো কথা বলেন, কিন্তু এ হাদীস বর্ণনা করার পেছনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে তা থেকে থাকেন গাফেল এবং তা পূর্ণ করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ হিজরী ৭০২ সনে ইন্তেকাল করেন।

চেঙ্গীজকেও রুখে দিল

ঈসায়ী তের শতকের শেষের দিকের ঘটনা। তাতারীরা মুসলিম বিশ্বের ওপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বুখারা এবং তার আশেপাশের এলাকায় তারা মুসলমানদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। শিশু-বৃদ্ধ, যুবক সবাইকে হত্যা করছিল। সে এক নারকীয় বীভৎস দৃশ্য!

বুখারা ছিল আলেম-উলামা ও ইমামদের শহর। তাদের ঈমান ছিল টগবগে তাজা। তাতারীদের মোকাবিলা করলো তারা জানপ্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিল হাজারে হাজারে। কিন্তু তাতারী স্রোতের সামনে দাঁড়াতে পারলো না। খড়কুটোর মতো উবে গেলো তারা, তাতারীরা শহরে প্রবেশ করলো। পথে-ঘাটে অলিতে গলিতে হত্যাকান্ড শুরু হলো। লাশের স্তূপ জমে উঠলো। নিরপরাধ মানুষের রক্তের স্রোত বয়ে চললো পথের ওপর দিয়ে। মুসলমানরা জামে মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

চেঙ্গীজ খাঁন ঘোড়ায় চড়ে মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়লো। ঘোড়া থেকে নেমে মিম্বারের ওপর উঠলো। সেখানে একটি কুরআন মজিদ রাখা ছিল। চেঙ্গীজ খাঁন সেটা হাতের ওপর তুলে নিলো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে লাগলো। ওদিকে শহরে মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

সাইয়েদ শামসুদ্দীন দু'হাত দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মুসলমানদের ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। চেঙ্গীজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ "ওহে নরহত্যাকারী! নিজেকে তুমি আসমানী গযব আখ্যা দিয়ে থাকো। তোমার ফিরাউনী বক্তব্যের জবাব শোনোঃ তুমি হচ্ছো মূর্তিমান অনিষ্ট ও বিপর্যয়। আল্লাহ আমাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন, তাই তোমার মতো হিংস্র পশুকে শাস্তি স্বরূপ আমাদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছেন। শুনে রাখো, যে ইসলামের প্রতি তুমি বিদ্রুপ করছো, তোমার মতো বর্বর শক্তি তার মর্যাদাহানি করার ক্ষমতা রাখে না। ইসলাম একটি মহান ধর্ম হিসাবে জীবিত থাকবে এবং তোমার নামে পৃথিবীর মানুষ গালি দেবে। বুখারায় ইসলামী পতাকা অবনত হয়েছে কিন্তু সারা দুনিয়া থেকে তুমি এই পতাকাকে মিটিয়ে ফেলতে পারবে না। আমাদের শির একমাত্র আল্লাহর সামনে নত হয়, তোমার সামনে নত হবে

না। তুমি আমাদের শরীরকে গোলাম বানাতে পারো কিন্তু আমাদের দিল সব সময় তোমার ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকবে।"

সাইয়েদ শামসুদ্দীনের আক্রমণ এমন আকস্মিক, শাণিত ও কার্যকর ছিল যে, চেঙ্গীজ তা কল্পনাই করতে পারেনি। নিখাদ ও দুঃসাহসিক সত্য ভাষণ তার তলোয়ারকেও কোষমুক্ত করতে দিল না।

হাদীস সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি মু'জিযার চাইতে কম নয়

নবীরা এসেছেন। তাঁরা আল্লাহর বাণী এনেছেন এবং নিজেদের কথাও বলে গেছেন। তাঁরা নিজেরা যে ধরনের কথা বলেছেন সেই ধরনের জীবন-যাপনও করে গেছেন। এই ধরনের এমন কোনো মহাপুরুষের কথা আজো জানা যায়নি যিনি যা বলেছেন তার উল্‌টোটা করে গেছেন।

নবীরা যে বাণী এনেছেন, তাকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ কুরআন ও অন্যান্য কিতাব। কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব যেহেতু আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন, তাই তা আজো যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। কোন প্রকার বিকৃতি তাকে স্পর্শ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। কিন্তু অন্য কিতাবগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নেননি। বরং সংশ্লিষ্ট উম্মতের উলামায়ে কেরামের ওপর দিয়েছিলেন, যেমন কুরআনে সূরা মায়েদার ৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "ওয়ার রাব্বানীয়্যুনা ওয়াল আহ্‌বারা বিমাস্‌তুহ্‌ফিযু মিন কিতাবিল্লাহ" অর্থাৎ ইহুদি রব্বানী ও আলেমগণ তওরাতের পথনির্দেশনা অনুসারে তাদেরকে বিধান দিতো, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষণকারী বানানো হয়েছিল। এখানে সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে না নিয়ে ইহুদি আলেমদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। আলেমরা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। ফলে বিকৃতি সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু কুরআনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিস্ময়কর! একটি গ্রন্থের বিকৃত কেবল তার মূল বাণীর মধ্য দিয়েই হয় না, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের মাধ্যমেও হয়। মূল বাণীর যথার্থতা তো ফুটে ওঠবে তার প্রয়োগের মধ্য দিয়েই। বাণীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ভিন্নতর করা হলে তার

প্রয়োগও হবে ভিন্ন, যা বাণীর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। ফলে মূল কিতাবে বাহ্যত এ বিকৃত থাকলেও আসলে চরিত্রগতভাবে বিকৃত হয়ে যাবে। অর্থাৎ মূল কিতাব অবিকৃত থাকলেও মানুষ তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে না।

তাই কুরআনকে অবিকৃত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করার সাথে সাথে তার সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের পদ্ধতিও নিরূপন করে দিয়েছেন।

কুরআনের নবী সাথে সাথেই তিনি এমন একটি দায়িত্বশীল উম্মত তৈরি করে দিয়েছেন, যারা প্রথম দিন থেকেই নবীর সমস্ত কথা ও কর্মকে কণ্ঠস্থ লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন।

প্রথমতঃ এমন এক যুগে এ নবীর আবির্ভাব হয়েছে যখন বর্ণমালার প্রচলন সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মানুষ কেবল শ্রুতিনির্ভর নয়, লিপি নির্ভরও হয়ে ওঠেছিল। ফলে কোনো বক্তব্য সংরক্ষণ ও বিকৃতি মুক্ত রাখার সহজ পথও মানুষের করায়ত্ব হয়েছিল। একারণে কুরআনের সাথে সাথে নবীর বাণীও সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ নবী নিজে ছিলেন কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ। 'সালু কামা- রাআইতুমূনী উসাল্লী' আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো তেমনি করে নামায পড়ো। এ ছিল নবীর পদ্ধতি, তাঁর সাহাবারা এটা পুরোপুরি অনুভব করতেন ও জানতেন। তাই তাঁরা কুরআনের আয়াত যেমন শুনতেন ও আয়ত্ব করতেন ঠিক তেমনি নবীর কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কেও পূর্ণ সচেতন থাকতেন এবং মেনে চলতেন। তাঁরা নিজেদের জীবন নবীর জীবনের অনুরূপ করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

তৃতীয়তঃ তাঁরা নবীর প্রত্যেকটি বাণী ও কর্ম আত্মস্থ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। নবীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোনো একটি ইংগিতও তাঁরা অবহেলা করেননি। কোনো একটি কথা বলার সময় তিনি ডান হাতের অনামিকার সাথে তর্জনী এক করেছেন, হাদীস বর্ণনাকারীরাও ঠিক তেমনি হাদীসটি বলার সময় তর্জনীও অনামিকা এক করে দেখিয়েছেন। একথা ঠিক, সেটা টেলিভিশন ও ভিডিও ক্যামেরার যুগ ছিল না। কিন্তু হাদীসের কোনো একটা অধ্যায় পড়লে মনে হবে যেন ভিডিও ক্যামেরায় তোলা

একটি ছবি টেলিভিশনের পর্দায় চমৎকারভাবে ফুটে ওঠছে। নবীর জীবনের কোনো অধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে নেই। এমন কি স্ত্রী মহলে তিনি কি করেছেন, তাও সবার সামনে হুবহু এসে গেছে, যতটুকু জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সবার জন্য জানা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ সংরক্ষণ ব্যবস্থাটা এমন অভিনব ও নিখাদ যে, মানুষের কার্যক্রম সংরক্ষণের এর চাইতে নিখুঁত আর কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। যেমন রাসূলের বাণী একজন শুনেছেন, তার থেকে আর একজন শুনেছেন, তার থেকে আর একজন এবং তার থেকে আর একজন। এভাবে গ্রন্থাবদ্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সিলসিলা চলতে থাকে। তারপর এই বর্ণনাকারীর সংখ্যা আবার একজন দু'জন নয়, কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কেবল একটি স্তরে কয়েকশ'তে পৌঁছে গেছে। এ অবস্থায় বর্ণনাকারীদের যথার্থতা নিরূপণের প্রশ্ন দেখা দেয়। তাই শুরু হয় হাদীসের জারাহ বা কাদাহ অর্থাৎ হাদীস সমালোচনা-পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। হাদীসের সংখ্যা কয়েক লাখে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু একমাত্র হাসান ইবনে আহমদ সমরকন্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবে এক লাখ হাদীস সংগৃহীত হয়েছে বলে জানা যায়। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদে আহমদ'কে বৃহত্তম কিতাব বলে মনে করা হয়। প্রত্যেক সাহাবী বর্ণিত হাদীস এতে পৃথক অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ হিসেবে এতে ৭শ' সাহাবী বর্ণিত মোট ৪০ হাজার হাদীস সংগৃহীত হয়েছে। ইমাম বুখারী কয়েক লাখ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু সহীহ্ আল-বুখারীতে সন্নিবেশিত করেছেন মাত্র ৪ হাজারের মতো হাদীস।

হাদীসের বর্ণনাকারী তথা সনদের বিচারে হাদীসকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণনাকারীর সংখ্যা হিসেবে হাদীসকে বিভক্ত করা হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি, ধারণক্ষমতা ও আদালত তথা ঈমানী মজবুতী ও তাকওয়া এবং এই সঙ্গে শিরক, বিদআত ও কবীরা গুনাহ না করা এবং বারবার সগীরা গুনাহ করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে

রাখার ভিত্তিতেও হাদীসকে বিভক্ত করা হয়েছে। আবার হাদীসের সনদ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো ও না পৌঁছানোর মাধ্যমেও বিভক্ত করা হয়েছে। এভাবে হাদীস সহীহ, হাসান, মুতাওয়াতির, মশহুর, গরীব, আযীয, মারফু, মাওকূফ, মাকতু, মুত্তাসিল, যঈফ, মাওযু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে এর মধ্যে হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে, প্রথম শ্রেণীর সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম।

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী যারা সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অথবা অন্য সাহাবীর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমাম জুরআ রাযীর মতে তাদের সংখ্যা ছিলো ১ লাখ ১৪ হাজার। আসমাউর রিজালের কিতাবগুলোতে হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী, তাবেঈ, তাবা-তাবেঈ ও অন্য রাবীদের তথা কয়েক লাখ লোকের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকেই হাদীস সংগ্রহ করা, লেখা ও তার ওপর আমল করার কাজ চলে। হাদীস পর্যায়ে চলে হাদীসের 'কিতাবত' অর্থাৎ কেবলমাত্র বিক্ষিপ্ত ও অপরিকল্পিতভাবে হাদীস লিখে রাখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও প্রবীণ সাহাবাদের আমলে এটিই চলতে থাকে। যে যেখান থেকে পান কিছু হাদীস সংগ্রহ করে লিখে রাখতেন। অথবা নবী (সাঃ) নিজেই কাউকে কোনো নির্দেশমূলক হাদীস লিখিয়ে দিয়েছেন। এটি চলে প্রথম যুগে অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে নিয়ে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফত লাভ (৯৯ হিজরী) পর্যন্ত মোট ১১২ বছর। এরপর এই আমলের শেষের দিকে ইবনে শিহাব যুহরীই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে হাদীস লেখার অর্থাৎ যা শুনতেন তা সবই লিখে নেবার ধারা সৃষ্টি করেন। এ ধরনের লেখাকে তখন 'তাদবীন' অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করা বলা হতো। অতপর দ্বিতীয় হিজরীর শুরুতেই ইমাম মালেক সর্বপ্রথম যথারীতি কিতাব আকারে হাদীস সংকলন করেন। একে বলা হয় 'তাসনীফ'। এরপর থেকে পরবর্তী কয়েকশ' বছর পর্যন্ত হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবীর বাণী ও কর্মকান্ডকে সঠিকরূপে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার জন্য এভাবে হাজার হাজার লাখ লাখ লোককে সমগ্র জীবন, সামর্থ ও মেধা উৎসর্গ করতে দেখা যায়নি। নবীর বাণী ও কর্মকান্ড অবিকৃত থাকার কারণে আল্লাহর বাণীর অবিকৃত থাকাটা যথার্থ রূপ নিয়েছে। বনী ইসরাইলের আলেমদেরকে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর বাণীর ও কিতাবের হিফাজত করার। কিন্তু তারা তা করেনি। অন্যদিকে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আলেমগণ আল্লাহর নবীর বাণী ও কর্মকান্ডকে সংরক্ষিত ও অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের মহাব্যবস্থাকে সফলকাম করতে সাহায্য করেছেন। এটা আল্লাহর মহা-ব্যবস্থাপনায়ই সম্ভব হয়েছে। তাই এটা মু'জিযার চাইতে কম নয়।

সমাপ্ত

سيف الحق المشع

(باللغة البنغالية)

THE RADIANT SWORD OF TRUTH

(In Bangla Language)

'শাসকের সম্মুখে সত্য উচ্চারণ করা সর্বোত্তম জিহাদ' এবং 'আলেমগণ নবী ও রাসূলগণের উত্তরাধিকারী'-এই দু'টি আপ্ত বাক্যের সরল পরিস্ফূটন ঘটেছে বক্ষমান গ্রন্থের রচনাবলীতে।

উমাইয়া এবং আব্বাসী আমলে নামেমাত্র খিলাফত ছিল। খিলাফতের নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। খিলাফতের প্রায় সকল ইন্সটিটিউশন ধূলিসাৎ করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের নামে স্বেচ্ছাচারী শাসন চলতে থাকে।

ইতিহাসের ধূসরতম সে অধ্যায়ে যেসব মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মুফাস্সির, ফকীহ্, হাদীসবেত্তা এবং আলেম-উলামা একনায়ক শাসকদের ইসলাম বিরোধী কাজের সরাসরি সমালোচনা করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, দ্বীনে-হকের কথা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন এবং এসব করতে গিয়ে শাসকের কোপানলে পড়েছেন, অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টিম রোলার সহ্য করেছেন, সেসব ক্ষণজন্মা মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে এই গ্রন্থের উপস্থাপনা।

দা রু স সা লা ম

রিয়াদ, লাহোর, হিউস্টন, নিউইয়র্ক, ঢাকা